মাসুদ রানা

মাদকচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

মাদক চক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন

গল্পটা ঋজু মুর্তজা আর ডোনা জেফরিকে নিয়ে। দু'জনেই
রানা এজেন্সির এজেন্ট। পরস্পরকে ভালবাসে।
অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটল একজন খুন হয়ে যাওয়ায়। শোককে
শক্তিতে পরিণত করল মাসুদ রানা, দ্বিতীয়জনকে বাঁচানোর
জন্যে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করল। পৃথিবীর নানা জায়গায় নতুন
করে পপির চাষ শুরু হয়েছে, তাতে না আছে পাতা, না আছে
পাপড়ি। বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, প্রভাবশালী বহু লোক
জড়িত, তাদের মধ্যে রানার ঘনিষ্ঠ লোকজন আর
বন্ধু-বান্ধবও আছে, কিন্তু পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে না কাউকে।
আয়ারল্যান্ডে পৌঁছে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল রানা,
সিন্ডিকেটের সশস্ত্র খুনীরা ওকে চারদিক থেকে ধাওয়া করছে।
ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে অপরাধীদের পরিচয়।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, রানার বাঁচার উপায় কি!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ২৮৫

মাদকচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7285-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

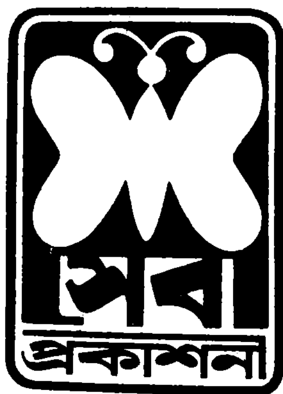
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-285
MADAKCHAKRO
A Thriller Novel
By: QAZI ANWAR HUSAIN



বত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ

এক

লম্বা সুখটান দিয়ে গলগল করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সৈয়দ ঋজু মুর্তজা, শুকনো ঘাসে সিগারেটটা ফেলে বুট দিয়ে বারবার ঘষে আগুন নেভাল। উত্তরে বরফ ঢাকা এলবার্জ পর্বতমালা। চূড়া আর ঢাল ছুঁয়ে ধেয়ে আসা বাতাস এত ঠাণ্ডা যে সূচের মত বিঁধছে মুখে। জ্যাকেটের দু'পকেটে হাত গলিয়ে শীতে হি হি করছে সে, জীপের গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে একটা ইরানী সামরিক হেলিকপ্টারের দিকে।

পপি খেতের শেষ প্রান্তে স্থির হলো ওটা, তারপর অকস্মাৎ খসে পড়ার ভঙ্গিতে অনেকটা নিচে নেমে এল, রোটরের তীব্র বাতাসে আলোড়িত গাছগুলো সামুদ্রিক ঢেউ-এর আকৃতি পাচ্ছে। ফিউজিলাজে আটকানো ট্যাংক থেকে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রঙবিহীন তরল পদার্থ, খেতের ওপর দিয়ে সগর্জনে ছুটে এল যান্ত্রিক ফড়িং।

'আমরা তৈরি, মি. মুর্তজা।'

ইরানী আর্মি কর্নেলের দিকে ঘাড় ফেরাল ঋজু, ভদ্রলোকের দৃষ্টি অনুসরণ করে মেঠো পথে এক সারিতে দাঁড়ানো ট্রাক বহরের ওপর চোখ বুলাল। পপি খেতে শেষবারের মত প্যারাফিন স্প্রে করে হেলিকপ্টারটা ট্রাক বহরের পিছনে নামছে। রেডিও হ্যান্ডসেটে কথা বললেন কর্নেল, খেতের ওপার থেকে বাতাসে ভর করে ভেসে এল ভারী গলার কমান্ড। এক মুহূর্ত পর ট্রাক

বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল একটা জীপ, মেঠো পথ ধরে এগোবার সময় ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে, রেডিও অ্যান্টেনার মাথায় পতপত করে উড়ছে লাল একটা পতাকা।

খেতটা প্রায় চারকোনা, বিশ একর বা কিছু বেশি হবে, গাঢ় সবুজ উদ্ভিদে ভরে আছে। ফলগুলো লম্বাটে বৈদ্যুতিক বালব্-এর মত দেখতে। একটা গাছ জীপের হুডে পড়ে রয়েছে, হাতে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে সেটা নাড়াচাড়া করছে ঋজু। পপি ফলকে মুড়ে রাখা পাপড়িগুলো ঠিকমত বাড়েনি। ওগুলো শুধু যে অসম্পূর্ণ তা নয়, ফলের সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে আছে যে খুব কাছ থেকে না দেখলে আলাদাভাবে চেনা সম্ভব নয়। লালচে-বেগুনি রঙ, এত গাঢ় যে কালো বললেই হয়। গাছের পাতারও ওই একই অবস্থা, রোগাক্রান্ত, গাছের চেহারায় অশুভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। ফলটা ঝাঁকাল সে, ভেতর থেকে খটখট আওয়াজ বেরুল।

'সফল একটা অপারেশন, কি বলেন?' কর্নেলের চেহারায় গম্ভীর হাসি।

চুপ করে থাকল ঋজু, সায় দিতে পারছে না। পপি গাছের এই রূপান্তর কাকতালীয় কোন ঘটনা নয়, জানে সে। বোটানি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু তার জানা নেই, তবে এটুকু অন্তত জানে যে নতুন প্রজাতির কোন প্রাণ, তা সে উদ্ভিদই হোক বা প্রাণী, হঠাৎ করে শুধুমাত্র একটি স্থানে অঙ্কুরিত হতে পারে না। পাপড়িবিহীন পপি ফুল জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর গবেষণার ফসল, এর পিছনে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের অবদান থাকতেই হবে। ব্যাপারটা যেহেতু বেআইনী ড্রাগ ব্যবসা, অবৈধ পন্থায় কোটি কোটি ডলার কামাবার সহজ পথ, এর পিছনে আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট জড়িত থাকতে বাধ্য। গত ছ'মাসে আরও চারটে রিপোর্ট পেয়ে এশিয়া মাইনর আর ফার ইস্ট-এর কয়েক জায়গায় তদন্ত চালিয়েছে সে, তবে চাক্ষুষ প্রমাণ এখানেই প্রথম দেখতে

পেয়েছে।

হাতের জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে খেতে আগুন ধরিয়ে দিল সৈনিকরা। প্যারাফিন ভেজা খেত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। দশ মিনিট পর জীপ থেকে নেমে এসে কর্নেলের সঙ্গে কথা বলল একজন লেফটেন্যান্ট। ঋজুর দিকে ফিরে কর্নেল বললেন, 'লেফটেন্যান্ট বলছে, আগুন খুব ভালভাবেই ধরেছে, খেতের একটা গাছও রক্ষা পাবে না। আগুন নেভার পর খেতটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে, শিকড় গজাতে পারে এমন বীজ পাওয়া গেলে ধ্বংস করার জন্যে। দু'মাস পরপর এসে দেখে যাব আমরা।'

তিন হাজার গ্যালন প্যারাফিন বিশ একর আফিম খেতকে পোড়াতে খুব বেশি সময় নিল না। গরম আফিমের মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল বাতাস। ঋজু খুব ক্লান্ত বোধ করছে, তাড়াতাড়ি তেহরানে ফিরে যেতে চায় সে, হোটেলে পৌঁছে বিশ্রাম নিতে না পারলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তারপর ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক কন্ট্রোল কমিশন-এর হেডকোয়ার্টার লন্ডনে নতুন প্রজাতির এই পপি গাছ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে। রূপান্তরিত এই পপি গাছের চাষ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া চলে দুনিয়ার আরও বহু জায়গায় এর আবাদ শুরু হয়ে গেছে। কমিশন যদি এখনই সতর্ক না হয়, হেরোইনের উৎপাদন সর্বকালের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে। মনে মনে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছে ঋজু। বছর দুই হলো পপি চাষ একরকম বন্ধই হয়ে গেছে, কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে আবার বোধহয় নতুন একটা জোয়ার আসতে যাচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক কন্ট্রোল কমিশন জাতিসংঘের একটা অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান, কয়েকটা সদস্য রাষ্ট্রের যোগ্য ও সৎ পুলিস অফিসার, কাস্টমস কর্মকর্তা আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের অভিজ্ঞ অপারেটরদের নিয়ে

গঠিত। আইএনসিসি-র জন্মলগ্নেই রানা এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানাকে কমিশনার পদটি অলংকৃত করার অনুরোধ জানানো হয়। সেই অনুরোধ বা প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে রানা। ওর আসল কাজ তো বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই হিসেবে দেশের বিরুদ্ধে কোথায় কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে তদন্ত করে দেখা, প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নিয়ে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিসিআই-এর কাভার হলেও, রানা এজেন্সির কর্মপরিধির বিস্তৃতিও বিশাল, কাজেই ডিরেক্টর হিসেবে ওর ব্যস্ততার সীমা-পরিসীমা নেই। তার ওপর অনুরোধে ঢেঁকি গেলায় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টা ও 'নুমা'-র অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয় ওকে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের জন্যে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অপারেশন চালাতে যেতে হয়, ইউএন-এর অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের কমান্ডার হওয়ার সুবাদে। কাজেই আইএনসিসি-র কমিশনার হবার ইচ্ছা বা সুযোগ কোনটাই ওর ছিল না। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে নিজের অপারগতার কথা বুঝিয়ে বলে ও, তিনিই আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধটা জানিয়েছিলেন ওকে। ভদ্রলোক তখন রানা এজেন্সির দক্ষ দু'জন অপারেটরকে ধার হিসেবে চান। রানা একজন অপারেটর অর্থাৎ সৈয়দ ঋজু মুর্তজার নাম বলে, তবে ঋজুর সঙ্গে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি ডোনা জেফরিকে নিতে হবে; এনসিসি হেডকোয়ার্টারে আলাদা অফিস থাকতে হবে ওদের, ঋজু স্বাধীন ভাবে তদন্ত পরিচালনা করবে, এবং শুধু আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে নয়, রানা এজেন্সির লন্ডন শাখাতেও নিয়মিত রিপোর্ট করবে সে। প্রসঙ্গত রানা জানিয়ে রাখে, ঋজু মুর্তজা রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার প্রধান, আপাতত তার পদে অন্য কাউকে নিয়োগদান সম্ভব নয়, অর্থাৎ আইএনসিসি-তে পার্টটাইম কাজ

করবে সে।

চব্বিশ ঘণ্টা আগে, সারাদিন প্রচণ্ড খাটা-খাটনির পর, লন্ডনে ছিল ঋজু। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ইরানের জিলান ডিস্ট্রিক্টে, চোখে জ্বালাময়ী ধোঁয়া নিয়ে বেআইনী পপি খেত পুড়তে দেখছে। ঘাড় ফিরিয়ে দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটার দিকে তাকাল সে, ওটার কাছাকাছি হাতকড়া পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে খেতের দুই মালিককে, চারজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। লোক দু'জন কুর্দী চাষী, কংকালসার দেহ আর ছেঁড়া ফতুয়া দেখেই বোঝা যায় যে তিনবেলা পেট পুরে খেতেও পায় না। 'এই বীজ ওরা পেল কোথায়?' হাতের পপি ফলটা দেখিয়ে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করল ঋজু। 'পাপড়ির এই অসম্পূর্ণতা প্রকৃতির খেয়াল বলে চালানো যাবে না, নিশ্চয়ই কোন ড্রাগ সিন্ডিকেটের গবেষণার ফসল।'

'গত শীতের শেষ দিকে ওদের গ্রামে দু'জন লোক এসেছিল, বীজ দেখিয়ে বলে এগুলো ফলালে এক হাজার রিয়াল দেয়া হবে। এই দু'জনই শুধু রাজি হয়। বলছে, ওরা জানত না যে আফিমের চাষ করছে।' পপি ফলটা ঋজুর হাত থেকে নিলেন কর্নেল। 'পাপড়ি তো নেই বললেই চলে, তাই না? আমেরিকান স্যাটেলাইট ডিটেকশন সিস্টেমে সেজন্যেই খেতের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি, পড়বেও না। আমরাও তো ঘটনাচক্রে খেতটা পেয়ে গেছি। দূর থেকে দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল গোখাদ্য...'

'এরকম খেত আরও অনেক আছে, থাকতে বাধ্য,' বলল ঋজু। 'সেগুলো আপনারা কিভাবে খুঁজে বের করবেন?'

'টহল দিয়ে,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন কর্নেল।

'ওহ্ গড! তাহলে তো এক বছর লেগে যাবে শুধু এই একটা প্রদেশ চেক করতে।'

কথা না বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন কর্নেল।

হাতকড়া পরানো চাষী দু'জনের দিকে তাকাল ঋজু। 'ওদের

নিয়ে কি করা হবে?'

কর্নেলের উত্তর শুনে শিউরে উঠল সে। সরকারী লাইসেন্স ছাড়া আফিম চাষ করা ইরানে গুরুতর অপরাধ, শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আজ সকালেই বিচার অনুষ্ঠানের ঝামেলা দ্রুত শেষ করা হয়েছে। বিচারকের সামনে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে লোক দু'জন। রায় হয়েছে, ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা হবে। ঋজু যে হেলিকপ্টারে চড়ে তেহরান থেকে এখানে পৌঁছেছে তার পাইলট রায়ের কপি সঙ্গে করে এনেছে।

ঋজুর মনে অনেক কঠিন প্রশ্ন জাগছে, কিন্তু কোনটারই সদুত্তর পাওয়া যাবে না জেনে চুপ করে থাকল। বোকাসোকা দু'পাঁচজন চাষীকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারলে কি আফিমের এই বেআইনী চাষ বন্ধ হবে? লাভের বখরা নিয়ে বা মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে আন্তর্জাতিক কোন ক্রাইম সিন্ডিকেটকে সাহায্য করছে কিছু ইরানী ব্যবসায়ী আর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তাদেরকে চিহ্নিত করার উপায় কি?

'মি. মুর্তজা, পাইলটকে আমি নির্দেশ দিয়েছি,' কর্নেল বললেন, 'আপনি রেডি হলেই সে আপনাকে তেহরানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কয়েক দিন পর নমুনা হিসেবে কিছু বীজ আর চারা লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হবে।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে আবার বললেন, 'নাকি আপনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো কিনা দেখে যেতে চান?'

'মানে?' হতচকিত দেখাল ঋজুকে।

'আমার ওপর নির্দেশ আছে খেতের পাশেই অপরাধী দু'জনকে গুলি করে মারতে হবে,' বললেন কর্নেল। 'আপনি কি...'

'মাফ করবেন,' বলে দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের দিকে এগোল ঋজু।

তেহরান থেকে প্যারিসে পৌঁছুতে দশ ঘণ্টা লাগল। কানেকটিং

ফ্লাইট দু'ঘণ্টা পর, ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজ লন্ডনগামী যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে ফাইভ স্টার হোটেলে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে। ঋজুর সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট আছে, কাস্টমসে কোন ঝামেলা পোহাতে হলো না। টার্মিন্যাল ভবনের বাইরে এসি লাগানো মিনিবাস অপেক্ষা করছে, উঠে বসলেই পৌঁছে দেবে হোটেলে। কিন্তু টার্মিন্যাল ভবন থেকে বেরুনোই গেল না, লাউডস্পীকারে শোনা গেল, 'মি. সৈয়দ ঋজু মুর্তজা, আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে, ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজ ইনফরমেশন ডেস্কে চলে আসুন, প্লীজ।'

ডেস্কে এসে নীল রঙের একটা এনভেলাপ পেল ঋজু। এনভেলাপ ছিঁড়ে মেসেজটা পড়ল সে–'বাল্টিকে একটা চালান ধরা পড়েছে। কোপেনহেগেন ন্যাভাল কমান্ড-এ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন ক্যাপটেন হ্যানস এরিকসন।–উলরিখ বাউচার।'

ক্লান্ত ঋজুর রাগ হবার কথা, তার বদলে উত্তেজনা বোধ করল। উলরিখ বাউচার আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, তিনি যখন ওকে কোপেনহেগেনে যেতে বলছেন তখন ধরে নিতে হবে বড় ধরনের কিছু একটা ঘটেছে। চালান মানে যে হেরোইন, তাতে আর সন্দেহ কি। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখল সে, ডেস্কে বসা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'এস.এ.এস. ডেস্কটা কোন দিকে বলুন তো?'

প্যারিস থেকে সরাসরি কোপেনহেগেন পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ফ্লাইট, ট্রাইডেন্ট বিমান কাস্টরাপ এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল বিকেল চারটে পাঁচে। সবার আগে প্লেন থেকে নেমে কাস্টমস শেডে ঢুকে পড়ল ঋজু, সেখান থেকে বেরিয়ে রেন্ট-আ-কার কোম্পানী অ্যাভিস-এর ডেস্কে পৌঁছে এনভেলাপে মোড়া একটা টেলিগ্রাম পেল। লন্ডন থেকে তার জন্যে একটা গাড়ি রিজার্ভ করে রেখেছে ডোনা। শুধু

তাই নয়, ফাইভ স্টার হিলটনের একটা কামরাও দু'দিনের জন্যে রিজার্ভ করেছে সে। প্রাইভেট সেক্রেটারির দায়িত্ববোধ আর দক্ষতার সত্যি কোন তুলনা হয় না, কথাটা আরেকবার মনে মনে স্বীকার করতে হলো। তবে মনটা নেচে উঠল অন্য কারণে–পরস্পরকে তারা ভালবাসে। ডোনা আইরিশ মেয়ে, গোঁড়া খ্রিস্টান পরিবারের সদস্যা, আর ঋজু উদারমনা বাঙালী মুসলমান; তাসত্ত্বেও দীর্ঘদিন রানা এজেন্সিতে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে ওরা। ধর্মীয় কারণেই বিয়েটা এখনও হচ্ছে না, তবে এই বাধা কিভাবে দূর করা যায় তা নিয়ে মাঝে মধ্যেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, আশা করা যায় সুষ্ঠু একটা সমাধান ঠিকই বেরিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডনে ফিরে ডোনার সান্নিধ্য লাভের প্রবল একটা ইচ্ছা ব্যাকুল করে তুলল তাকে। সিদ্ধান্ত নিল, হিলটনে উঠে বিশ্রাম নেয়ার আগে প্রথমে হাতের কাজটা সেরে নেবে।

অ্যাভিস ডেস্ক থেকে শহরের একটা ম্যাপ সংগ্রহ করল ঋজু, পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে গেল হারবার ডিস্ট্রিক্ট ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারের গেটে, ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে পরিচয়-পত্র দেখাতে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। নিজের অফিসে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল ক্যাপটেন হ্যানস এরিকসন, পরিচয় পর্ব শেষ হতেই ওকে নিয়ে জেটিতে চলে এল।

'ওই দেখুন, ওই ট্রলারটা, মি. মুর্তজা–ফ্রিগিট-এর পাশে বাঁধা।'

ল্যাঙ্গেলিনি হারবার মুগ্ধ করল ঋজুকে। মাছ ধরার নৌকো, যাত্রীবাহী লঞ্চ, বিলাসবহুল ইয়ট বহর থেকে শুরু করে যুদ্ধজাহাজ, সব রকম নৌ-যানই আসা-যাওয়া করছে। খুদে উপসাগরের দূর প্রান্তে নীলচে একটা সরু দাগ মনে করিয়ে দিল সুইডেন কত কাছে। এরিকসনের দেখানো ট্রলারটা উত্তর

আটলান্টিকের আর সব ফিশিং বোটের মতই দেখতে, আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ষাট ফুট লম্বা, দুই প্রান্ত বেশ উঁচু, একটা মাত্র মাস্তুল, সেটার চার ধারে পাল আটকানোর ফ্রেম আছে, আর আছে পানি থেকে জাল টেনে তোলার যান্ত্রিক সরঞ্জাম। ডেকের মধ্যভাগ পুরোটাই মুখ বন্ধ হোল্ড, হুইলহাউসটা পিছন দিকে। ক্ষতবিক্ষত চেহারা, যেন বহু বছর কোন যত্ন নেয়া হয়নি।

'গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণে মাছ ধরে ওটা,' হাতে সময় কম, তথ্যগুলো গড়গড় করে বলে গেল ক্যাপটেন এরিকসন, সাঁটলিপির সাহায্যে দ্রুত নোট নিচ্ছে ঋজু। যে-কোন ট্রলার বা জাহাজ কবে আমাদের এই বন্দরে ভিড়বে তার একটা তালিকা তৈরি করি আমরা। ট্রলারটার মাস্টার গুস্থার গুচম্যান কেপ ফেয়ারওয়েলের দক্ষিণ থেকে ওয়ায়্যারলেস রিপোর্ট পাঠায়, এঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তাই বন্দরে ফিরতে দেরি হবে।

'তারপর জুলিয়ানহাব স্টেশন থেকে খবর পাই আমরা, ট্রলার নিয়ে গুচম্যান আটদিন আগে রওনা হয়ে গেছে, ফলে আমরা ধরে নিই সরাসরি নর্থ আটলান্টিক ধরে ফিরে আসছে ওটা। পথে যে স্টেশনগুলো পড়বে, ওগুলোকে আমরা সতর্ক করে দিই, কারণ ডাকাডাকি করেও ট্রলার থেকে কোন সিগন্যাল পাচ্ছিলাম না। আরও দু'দিন অপেক্ষা করার পর এয়ার সার্চ-এর ব্যবস্থা করা হয়। দু'দিন আগে ডাচ নেভী রিপোর্ট করে, ওই আকৃতির একটা ট্রলারকে নর্থ সী-তে দেখা গেছে, উপকূলের কাছাকাছি। স্বভাবতই আমরা খুব অবাক হয়ে যাই—এঞ্জিনে যান্ত্রিক ক্রটি নিয়ে এতটা ঘুরপথ ধরে কেন ফিরছে গুচম্যান। নর্থ আটলান্টিক রুট ত্যাগ করে নর্থ সী হয়ে একেবারে উল্টোদিক থেকে এদিকে আসছিল।

'স্কাগেরাক-এ ট্রলারটাকে দেখতে পেয়ে থামাই আমরা। কাস্টমস-এর লোকজন সার্চ করে। ডেনিশ পুলিসকে হেরোইন পাবার খবর জানাই, তারা আইএনসিসি-কে জানায়।'

'কতটুকু?'

'হেরোইন? পনেরো কিলো।'

'মাই গড!' পেন্সিল দিয়ে খুলি চুলকাল ঋজু। 'বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় পনেরো কোটি টাকা দাম। দু'বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় চালান ধরা পড়ল। ট্রলার মাস্টার কি বলছে?'

'ক্রুরা মুখ খুলছে না, খুলবেও না,' বলল এরিকসন। 'গুচম্যান বলছে এখনও সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে তার ট্রলারে হেরোইন পাওয়া গেছে।'

'তা তো বলবেই। আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার লোক আপনাকে কোর্টহাউসে নিয়ে যাবে। তবে বলে রাখি, কোপেনহেগেনের অত্যন্ত নামকরা একজন সলিসিটর গুচম্যানের জামিনের ব্যবস্থা করছে।'

'কি বলছেন! জামিন পেয়ে যাবে? হাতে-নাতে ধরা পড়ার পর?'

এরিকসন জানাল, খুব মোটা টাকার জামানতের বিনিময়ে জামিন দেয়া হবে। সলিসিটর আদালতে ব্যাখ্যা করবেন, গুচম্যান হাতে নাতে ধরা পড়েনি, ট্রলারে তার অজ্ঞাতে কেউ হেরোইন লুকিয়ে রেখেছিল। ডেনিশ আইনে জামিন পেতে কোন ঝামেলা হবে না, সময়ও লাগবে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। জামিন পাবার পর কি হবে? কি আবার হবে, পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে গুচম্যান, কোন দিন আর ডেনমার্কে ফিরবে না। দশ বছর আগে ক্রাইম সিন্ডিকেটগুলো ক্ষমা করত না, কেউ ধরা পড়লে তাকে খুন করার ব্যবস্থা করত, সে যাতে মুখ খুলতে না পারে। কিন্তু এখন তারা নীতি পাল্টেছে, ধরা পড়া লোককে ছাড়িয়ে এনে অন্য কোথাও কাজে লাগায়–তার অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেয়।

এরিকসনের অফিস কামরায় ফিরে এল ওরা। ঋজু থামল দেয়ালে সাঁটা নর্থ আটলান্টিক চার্ট-এর সামনে। নোটবুকে চার্টের

একটা স্কেচ আঁকছে। 'আপনি বলছেন সোজা পথে এলে গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণ থেকে কোপেনহেগেনে পৌঁছুতে সাতদিন লাগার কথা, কিন্তু ঘুরপথ ধরে আসায় দু'দিন বেশি লেগেছে। এঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকলে আরও বেশি দেরি হবার কথা নয়? তাছাড়া, আপনাদের ওয়ায়্যারলেস মেসেজ পেয়েও সাড়া দেয়নি কেন?'

'কি মনে করেন, এ-সব প্রশ্ন তাকে আমরা করিনি?' একটু বিরক্তই হলো এরিকসন। তারপর মাথা নাড়ল। 'প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে গুচম্যান, তবে কোনটাই সত্যি বলে মনে হয়নি।' একটু থেমে আবার বলল, 'মি. মুর্তজা, আমরা জানি লোকটা স্মাগলার, কিন্তু কালো টাকা আর আইনের কাছে আমরা অসহায়।'

ঋজুও নাছোড়বান্দা। 'গ্রীনল্যান্ডে পপির চাষ সম্ভব নয়, কাজেই ট্রলারে হেরোইন তোলা হয়েছে অন্য কোথাও থেকে। গ্রীনল্যান্ড আর স্কাগেরাক, এই দুই জায়গার মাঝখানে কোথাও থেকে চালানটা গ্রহণ করে সে–ব্রিটিশ আইলস, বেলজিয়াম বা নেদারল্যান্ডের উপকূল এলাকা থেকে।'

'হতে পারে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এরিকসন। 'কিংবা হয়তো মাঝ সাগরে কোন জাহাজ থেকে ।'

স্কেচ আঁকা শেষ করে নোটবুকটা বন্ধ করল ঋজু। 'ঠিক আছে, গুচম্যানের সঙ্গে কথা বলে দেখি নতুন কিছু জানা যায় কিনা।'

কোর্টহাউসটা বন্দর এলাকার ভেতরই, থানার পাশে। হাজতীদের একটা সেলে রাখা হয়েছে গুচম্যানকে। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। ঋজুর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে মুচকি মুচকি হাসল সে, কোনটার জবাব দিল,

কোনটার দিল না–জবাবগুলোও আসলে প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার কৌশল মাত্র। গুচম্যান ইংরেজি জানে না, ঋজুকে দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়েছে। সেই জানাল, কোর্টের বাইরে কোপেনহেগেন পুলিসের একজন অফিসার আছেন, তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে সুদর্শন এক লোককে দেখল ঋজু, সিভিল ড্রেসে একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। তাকে দেখেই লোকটা বলল, 'মি. সৈয়দ ঋজু মুর্তজা, আপনাকে শুধু একটা কথাই বলার আছে আমার–আপনি আমাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন।'

ঋজু ঠাণ্ডা সুরে প্রশ্ন করল, 'আপনি আমার নাম জানেন?' মনে মনে একটা ধাক্কা খেয়েছে।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে অফিসার বলল, 'জানি বৈকি।'

'কিভাবে?'

'সেটা ব্যাখ্যা করতে আমি বাধ্য নই। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, বিদেশী লোকজনের পরিচয় জানাই আমাদের কাজ।'

'আমি আইএনসিসি অর্থাৎ জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্ব করছি,' কর্তৃত্বের সুরে বলল ঋজু। 'আমার কাজ হলো ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরা। শুধু ড্রাগ ব্যবসায়ীদের নয়, ঘুষ খেয়ে প্রশাসনের যে-সব কর্মচারী তাদেরকে সাহায্য করছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করার ক্ষমতাও আমার আছে। সেই ক্ষমতাবলেই আমি জানতে চাইছি, আপনি যে কোপেনহেগেন পুলিস ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার, সেটা প্রমাণ করুন।' লোকটার সামনে হাত পাতল সে। 'আইডি, প্লীজ।'

ঋজুর দৃঢ় আচরণে হকচকিয়ে গেছে লোকটা। কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে পরিচয়-পত্রটা বের করে দেখাল সে। পুলিস ইন্সপেক্টরের নামটা মুখস্থ করে রাখল ঋজু, পরে নোটবুকে লিখে

রাখবে। বারান্দায় খালি একটা বেঞ্চ পড়ে আছে, সরে এসে সেটায় বসল, সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করছে। দোভাষীর মুখ থেকে আগেই জেনেছে, গুচম্যানের সলিসিটর সংশ্লিষ্ট বিচারকের খাস কামরায় বসে আছেন, সরকারী উকিলের সঙ্গে তাঁর নাকি ঠাট্টাচ্ছলে তর্ক-বিতর্ক চলছে। এজলাস চলার সময় গুচম্যানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল, সে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করেছে।

-

কোর্ট হাউসের ভেতর থেকে এক লোক বেরিয়ে এসে বারান্দায় বসা পুলিস অফিসারকে নিচু গলায় কি যেন বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠানে নেমে এল অফিসার, জীপে চড়ে ড্রাইভারের পাশে বসল। দেখাদেখি ঋজুও বেঞ্চ ছেড়ে নিচে নামল, উঠে বসল নিজের ভাড়া করা টয়োটায়।

দু'মিনিট পরই ট্রলারের মাস্টার গুস্থার গুচম্যানকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বিশালবপু সলিসিটর। খোলা উঠানে নামী-দামী অনেক গাড়ি, গুচম্যানকে নিয়ে তিনি একটা ঝকঝকে মার্সিডিজে চড়লেন। গাড়িতে চড়ার আগে টয়োটার দিকে সরাসরি একবার তাকালেন ভদ্রলোক, দেখাদেখি ট্রলার মাস্টার গুচম্যানও। হাবভাবে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা স্পষ্ট, নিজেদের মধ্যে কিছু কথাও হলো; টয়োটার ড্রাইভিং সীটে বসা ঋজুর তা শুনতে পাবার কথা নয়।

মার্সিডিজ কোর্ট হাউসের প্রাঙ্গণ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। আগেই স্টার্ট দেয়া ছিল, পিছু নিল ঋজুর টয়োটা। পুলিস অফিসারকে নিয়ে জীপটা থাকল টয়োটার পিছনে।

বিশ মিনিট পর ফাইভস্টার অ্যামব্যাসাডর হোটেলে ঢুকল মার্সিডিজ। পুলিসের জীপ হোটেলের বাইরে থামল। ঋজু থামেনি, মার্সিডিজের পিছু নিয়ে হোটেল চত্বরে ঢুকে পড়েছে।

গুচম্যানকে হোটেলে তুলে দিয়ে বিশ মিনিট পর হোটেল

থেকে বেরিয়ে গেলেন সলিসিটর। ঋজুর টয়োটাকে দেখেও না দেখার ভান করলেন তিনি। তবে গেট দিয়ে মার্সিডিজ বেরিয়ে যাবার সময় রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো পুলিস জীপের দিকে একটা হাত তুলে নাড়লেন বা কোন সংকেত দিলেন, টয়োটায় বসে তা স্পষ্টই দেখতে পেল ঋজু।

নিজের দায়িত্ব, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ঋজু; সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে সেটা বাঁকা করতেও তার আপত্তি নেই। টয়োটা থেকে নেমে লবি হয়ে রিসেপশনে ঢুকল সে, ডেস্কে নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল গুচম্যানের ওপর নজর রাখার নির্দেশ আছে তার ওপর, কাজেই সে যে কামরায় উঠেছে তার কাছাকাছি একটা কামরা বুক করতে চায়। ডেস্ক থেকে ওকে জানানো হলো, গুচম্যান নামে কোন বোর্ডার হোটেলে ওঠেনি। সলিসিটরের নাম বলে ঋজু জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোকের সঙ্গে এক লোক বিশ মিনিট আগে কামরা বুক করেনি? খাতা খুলে পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল গুচম্যান তার নাম পাল্টে হোটেলে উঠেছে, গুচম্যানের বদলে খাতায় লিখেছে হ্যানস কোপেন। ইতিমধ্যে ডেস্কে হাজির হয়েছেন হোটেলের ম্যানেজার। ঋজুর কাগজ-পত্র দেখে সন্তুষ্ট হলেন তিনি। গুচম্যান ওরফে হ্যানস কোপেন-এর পাশের কামরাটা খালি থাকায় সেটা পেয়ে গেল ঋজু। তার মনে পড়ল, লন্ডন থেকে ডোনা ওর জন্যে হিলটনের একটা কামরা দু'দিনের জন্যে বুক করে রেখেছে, অথচ আজ রাতে সম্ভবত ও সেখানে উঠতে পারবে না।

পরদিন বেলা দুটোয় চার্টার করা প্লেনটা কোপেনহেগেন থেকে রওনা হয়ে সরাসরি হিথরো এয়ারপোর্টে এসে ল্যান্ড করল। রানওয়ের একপাশে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার সমস্ত কর্মচারী ও এজেন্ট পাথুরে মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘদেহী মাসুদ রানাকেও দেখা যাচ্ছে, সবার মত ওর কাঁধেও

কালো ব্যাজ। আইএনসিসি-র কর্মচারী ও অফিসাররাও এসেছে, সঙ্গে আছেন কমিশনার ডীন র‍্যাদারফোর্ড ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার উলরিখ্ বাউচার, তাঁরাও সবাই কাঁধে কালো ব্যাজ লাগিয়েছেন। রানওয়েতে কারও প্রবেশাধিকার নেই, রানার অনুরোধে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর মারভিন লংফেলো বিশেষ সুপারিশ করায় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন। মারভিন লংফেলো জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে আসতে পারেননি, ডেপুটি চীফ বিল হ্যামারহেডকে পাঠিয়েছেন। তার আগে টেলিফোনে রানার সঙ্গে কথা বলেছেন ভদ্রলোক, শোক ও সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি সাহায্য দরকার হলে নির্দ্বিধায় জানাবার অনুরোধ করেছেন।

লাশ নামাবার জন্যে কে কে প্লেনে উঠবে, এয়ারপোর্ট থেকে প্রথমে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কখন জানাজা হবে, লাশের সঙ্গে কে ঢাকায় যাবে, প্রতিটি সিদ্ধান্ত রানাকেই নিতে হয়েছে। বিশেষ একটা অফিশিয়াল কাজে স্পেনে ছিল ও, খবর পাওয়া মাত্র লন্ডনে চলে এসেছে, সময়ের অভাবে রানা এজেন্সির শাখায় বা রিজেন্ট পার্কের ধারে নিজের ফ্ল্যাটে যাবার সুযোগ পায়নি এখনও। প্লেনে স্যাটেলাইট ফোন ছিল, স্পেন থেকে লন্ডনে আসার পথে প্লেনে বসেই সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোয়নি, হেঁটে চলে এসেছে রানওয়ের যেখানে সবাই লাশ গ্রহণ করার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রানার চোখ দুটো সামান্য একটু লালচে হয়ে আছে, চেহারায় কোন রাগ বা আক্রোশ নেই, দৃষ্টি ঠাণ্ডা ও শাণিত। কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে কারও সঙ্গে কথা বলছে না।

কারও শোকই কম নয়, তবে সবচেয়ে বেশি মুষড়ে পড়েছে ডোনা। সে যে চিৎকার করে কাঁদছে, তা নয়। মানসিক রোগিনীর

মত ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না, এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারছে না, কখনও দু'পা পিছু হটছে, কখনও সবার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াচ্ছে, কিছুক্ষণ পরপরই থরথর করে কেঁপে উঠছে শরীরটা। রানা যে কখন নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেদিকে বোধহয় তার খেয়ালও নেই। কাঁধে হাত পড়তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, রানাকে চিনতে সময় নিল·দু'সেকেন্ড, তারপর ঝট করে ওর কাঁধে মুখ লুকাল, প্রিয়জনকে হারাবার বেদনা সহ্য করার জন্যে নিচের ঠোঁট এত জোরে কামড়ে ধরল যে চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। তার মাথায় একটা হাত রাখল রানা। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা নেই, সবার মত রানাও জানত ঋজুর সঙ্গে ডোনার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল।

কফিনটা আটজন মিলে প্লেন থেকে নামাল, বহনকারীদের মধ্যে রানা তো আছেই, একজন বাদে বাকি সবাই রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার লোকজন; অষ্টম ব্যক্তি আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার উলরিখ বাউচার। ঋজুর লাশ প্রথমে লন্ডনের একটা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে জানাজা পড়াবার পর তার স্থায়ী কর্মক্ষেত্র রানা এজেন্সির লন্ডন অফিসে নিয়ে এসে কিছুক্ষণ রাখা হলো। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম থেকে অনেক কর্মচারী-কর্মকর্তা শেষ বারের মত শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। ঋজুর এখানকার বন্ধু-বান্ধবরাও অনেকে এল। এরপর লাশ নিয়ে যাওয়া হলো আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে। ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে গেল কফিন। হাতে সময় কম, কারণ ওই একই চার্টার করা প্লেনে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে লাশ। সম্ভবত রানা পাশে ছিল বলে নিজেকে এতক্ষণ ধরে রাখতে পেরেছিল ডোনা, কিন্তু কফিনটা অ্যামবুলেন্সে তোলার সময় একেবারে বদ্ধ উন্মাদিনীর মত হয়ে

উঠল। কফিন আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল, ঋজুর নাম ধরে ফোঁপাচ্ছে। সবাই মিলে টেনে সরিয়ে আনল তাকে। ডোনা চিৎকার শুরু করল, অ্যামবুলেন্সে সে-ও উঠবে। তার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিল রানা। ওদের সঙ্গে উলরিখ বাউচারও এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন। সবশেষে উঠল রানা এজেন্সির এজেন্ট নাহিদ, সে লাশের সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত যাবে।

লাশ প্লেনে তুলে দিয়ে নিজের স্যাব গাড়ি নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরছে রানা, পাশে ডোনা। পিছনের সীটে বসেছেন উলরিখ বাউচার, রানা তাঁকে আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে নামিয়ে দেবে। প্লেনে লাশ তোলার সময় ডোনার চোখে পানি ছিল, তবে কোন রকম অস্বাভাবিক আচরণ করেনি সে।

পথে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা হলো না। এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙলেন বাউচার, বললেন, 'মি. রানা, স্যার, আজ রাতের ফ্লাইটেই আমাদের তিনজন এজেন্টকে কোপেনহেগেনে পাঠাচ্ছি আমরা, ঋজু কেন খুন হলো তদন্ত করে দেখবে তারা। এ-ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ আছে?'

'আপনাদের যা করার করুন, আমি আপত্তি করব না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তবে রানা এজেন্সির তরফ থেকে কেসটা আমি নিজে দেখব।'

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা চেপে রাখতে পারলেন না বাউচার। 'তাহলে তো খুবই ভাল হয়, মি.রানা। আপনি তদন্ত শুরু করলে খুনী বা খুনীদের পরিচয় অবশ্যই বেরিয়ে আসবে। আপনি শুধু ওদেরকে চিনতে পারলেই হয়, এদিক থেকে আমরা ডেনিশ পুলিসকে চাপ দেব অ্যারেস্ট করার জন্যে।'

'কোন প্রয়োজন নেই,' বলল রানা 'ঋজুর খুন হওয়ার জন্যে সরাসরি যারা দায়ী তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে কোর্ট বা পুলিসের সাহায্য আমার দরকার হবে না।'

আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আইনের প্রতি একটু বেশি শ্রদ্ধাশীল, কথাটা শুনে একটা ঢোক গিললেন। তবে এ-প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি কি তাহলে আজকালের মধ্যেই কোপেনহেগেন যাচ্ছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। তারপর বলল, 'ঋজুকে আমি নিজের হাতে ট্রেনিং দিয়েছি। খুন হলেও, খুনীদের পরিচয় সম্পর্কে সে কোন সূত্র রেখে যায়নি, এ আমি বিশ্বাস করি না। দু'একটা দিন অপেক্ষা করে দেখি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কোত্থেকে তদন্ত শুরু করব।'

'ডোনা, আপনি কি করবেন?' পিছন থেকে জানতে চাইলেন বাউচার। 'ছুটি নিয়ে আয়ারল্যান্ডে চলে যাবেন? মা-বাবার কাছে দিন কয়েক থাকলে মনটা ভাল হয়ে যেত।'

'না,' বলল রানা। 'ঋজু আর ডোনা আইএনসিসি-তে একসঙ্গে কাজ করছিল। ঋজু খুন হয়ে যাওয়ায় আমার সন্দেহ হচ্ছে খুনীদের তালিকায় ডোনার নামও থাকতে পারে। ওর নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' বাংলাতেই বলল ডোনা। 'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কেসটার দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন জানতে পারলে আপনাকেই ওরা প্রথম টার্গেট করবে।' শিউরে উঠল সে। 'আমার সাংঘাতিক ভয় করছে।'

'চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, ডোনা,' বলল রানা। 'ভয় পেলে চলবে কেন। এখন আমাদের কঠিন হবার সময়।'

'মাসুদ ভাই, নিজের জন্যে নয়, আমি আপনার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি,' শোকে ও উদ্বেগে ফুঁপিয়ে উঠল ডোনা।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা, তারপর নরম সুরে বলল, 'আমাকে নিয়ে কোন ভয় নেই, ডোনা। ভয় তোমাকে নিয়ে। আমার প্রতিটি নির্দেশ তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' চোখ মুছে বলল ডোনা।

বাউচার জানতে চাইলেন, 'মি. ঋজু ইরানে যাবার পর থেকে মিস ডোনা আইএনসিসি আর রানা এজেন্সি, দু'জায়গাতেই ডিউটি দিচ্ছিলেন, এখন তাহলে কি হবে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'আইএনসিসি-তে আমাদের কোন লোক এখন আর না থাকলেও ক্ষতি নেই।'

বাউচার যদি অসন্তুষ্ট হয়েও থাকেন, চেহারায় সেটা ধরা পড়ল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আপনি যা ভাল মনে করেন।'

দুই

ডোনাকে তার ফ্ল্যাটে আর উলরিখ বাউচারকে আইএনসিসি-র হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি নিজের ফ্ল্যাটে চলে এল রানা। ফ্ল্যাটটা এত বড় যে অনায়াসে দুটো পরিবার বসবাস করতে পারে, কাঠের ফ্রেমে আটকানো কাঁচ আর মখমলের পর্দা দিয়ে আলাদাও করা আছে। লন্ডনে এলে একটা দিকে থাকে রানা, এদিকটায় ছোটখাট ব্যক্তিগত একটা চেম্বারও আছে ওর, আধুনিক অফিস ইকুইপমেন্ট ও কমিউনিকেশন সিস্টেম সহ। ফ্ল্যাটের অপর অংশে থাকে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরী। স্বাতী সাধারণত রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় অফিস করে, তবে রানা ফ্ল্যাটে থাকলে ওর ব্যক্তিগত চেম্বারে ডিউটি দেয়।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই ঠাণ্ডা ও গরম পানিতে শাওয়ার সারল রানা,

নতুন কাপড়চোপড় আর জুতো পরে চেম্বারে এসে বসল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়িত কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল স্বাতী। ডেস্কের ওপর কাপ-পিরিচ রেখে জানতে চাইল, 'ঋজুর সঙ্গে কে গেল ঢাকায়?'

'নাহিদ,' রানার ছোট্ট জবাব। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঋজুর ফাইলটা এজেন্সির অফিস থেকে এনে রাখতে বলেছিলাম, এনেছ?'

'ওপরের দেরাজেই পাবেন,' বলল স্বাতী।

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও,' বলে দেরাজ খুলে ফাইলটা বের করল রানা।

ফাইলটা পড়ার সময় নিজের প্রায় অজান্তেই বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ও। ছ'বছর আগে রানা এজেন্সিতে ঢুকেছিল ঋজু। দু'বছর ধরে কাজ করছে আইএনসিসি-তে। চুক্তি অনুসারে ওখানে তার আর এক বছর কাজ করার কথা ছিল, তারপরই তাকে বিসিআই-এর অন্যতম একজন এজেন্ট হিসেবে নিয়োগদান করা হত। ফাইলে দেখা যাচ্ছে আপনজন বলতে ঋজুর এক ছোট ভাই আর মা-বাবা আছেন, ভাইটি সবেমাত্র ঢাকা ভার্সিটি থেকে সমাজকল্যাণে মাস্টার্স করেছে, বাবা লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। গ্রুপ ইনশিওরেন্স করা আছে, তা থেকে ঋজুর পরিবার বারো লাখ টাকা পাবে, আর আমেরিকান লাইফ ইনশিওরেন্স থেকে পাবে এক লাখ বত্রিশ হাজার ডলার।

বেল বাজিয়ে স্বাতীকে ডাকল রানা। ফাইলটা দেখিয়ে বলল, 'কোপেনহেগেন থেকে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলে ইনশিওরেন্স কোম্পানীতে পাঠিয়ে দিয়ো। ফাইলটা তোমার কাছে রাখো, অফিস থেকে ঋজুর যা পাওনা হয়েছে তার একটা হিসেব করে আমাকে দেখাবে।'

ফাইলটা নিয়ে চলে যাচ্ছে স্বাতী, পিছন থেকে আবার বলল রানা, 'তেহরান, প্যারিস বা কোপেনহেগেন থেকে নিশ্চয়ই

আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল ঋজু। ফ্যাক্স করে থাকলে আমাদের এখানকার মেশিনেও রিপোর্টের একটা কপি চলে আসবে।'

'তাই কি?' বিস্মিত দেখাল স্বাতীকে। 'কিন্তু মাসুদ ভাই, আমি তো জানি আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে ঋজু ফ্যাক্স করলে তার একটা কপি শুধু আমাদের লন্ডন শাখার অফিসে আসার কথা।'

'শুধু তুমি না, সবাই তাই জানে,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ঋজুকে একটা কোড নাম্বার দিয়ে রেখেছিলাম, ইংল্যান্ডের বাইরে থেকে ফ্যাক্স করার সময় সেটা ব্যবহার করলে এখানেও তার রিপোর্টের একটা কপি চলে আসবে।' খানিকটা অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত দেখাল রানাকে। 'ব্যাপারটা আমি কাউকে জানাইনি, তবে ধরে নিয়েছিলাম তুমি অন্তত নিজে থেকেই জানতে পারবে। এর আগেও ঋজুর করা ফ্যাক্সের কপি এখানে বসে আমি পেয়েছি। এর মানে হলো, ফ্যাক্স মেশিন থেকে কখন কি মেসেজ আসছে তুমি নিয়মিত চেক করো না।'

'দুঃখিত, মাসুদ ভাই,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল স্বাতী। 'আমি আসলে আপনি না থাকলে এখানে আপনার অফিসে বা কমিউনিকেশন রূমে ঢুকি না।'

'তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, তোমার এ-প্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স আছে, কথাটা ভুলো না,' বলল রানা। 'তাছাড়া, এটা ইমার্জেন্সী সিচুয়েশন–আমরা একজন খুন হয়ে গেছি। সব দিকে কড়া নজর না রাখলে চলবে কি করে!'

মাথা নিচু করে ধমকটা হজম করল স্বাতী, তারপর বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, সেজন্যে দুঃখিত, মাসুদ ভাই। আমি দেখছি কোন মেসেজ...'

'তুমি তোমার কাজ করো, আমি নিজেই দেখছি,' বলে স্বাতীকে বিদায় করে দিল রানা, তারপর পাশের কমিউনিকেশন

রুমে ঢুকল।

এক মিনিট পরই হাতে একটা ফ্যাক্স কপি নিয়ে চেম্বারে ফিরে এল রানা। ঋজু হিলটন হোটেল থেকে কাল রাতেই একটা মেসেজ পাঠিয়েছে।

দীর্ঘ রিপোর্ট, প্রথমবার দ্রুত পড়ে গেল রানা। ইরানের জিলান ডিস্ট্রিক্টের পপি খেতে কি দেখেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে ঋজু, ইরানী আর্মি কর্নেলের পুরো নাম উল্লেখ করে তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা জানাতেও ভোলেনি–দু'তিনদিনের মধ্যে পপি ফল আর গাছের নমুনা এসে যাবে আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে। প্যারিসে যাত্রা-বিরতির সময় উলরিখ বাউচারের মেসেজ পায় সে। অ্যাভিস ডেস্ক থেকে এনভেলাপে মোড়া টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পারে, তার জন্যে লন্ডন থেকে গাড়ি আর হিলটনের রুম রিজার্ভ করেছে ডোনা। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, প্রেমের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে প্রেমিকার দায়িত্ববোধ আর দক্ষতার প্রশংসাও করেছে সংক্ষিপ্ত একটা বাক্যে। ফ্যাক্সে একটা স্কেচও পাঠিয়েছে ঋজু, তাতে দেখানো হয়েছে মাছ ধরার ট্রলারটা গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে রওনা হয়ে ডেনমার্কে পৌঁছুবার জন্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত জলপথ ধরে আসেনি, এসেছে সতেরোশো মাইল ঘুরপথ ধরে–ডেনিশ নেভি সার্চ করায় ট্রলারে পাওয়া গেছে পনেরো কেজি হেরোইন। সোজা ও বাঁকা, দুটো পথই স্কেচে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর ঋজু কোপেনহেগেনের হারবার ডিস্ট্রিক্ট ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারের ক্যাপটেন হ্যানস এরিকসনের প্রসঙ্গে জানিয়েছে, লোকটা তার সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। ট্রলার মাস্টারের নাম, তার সলিসিটরের নাম, কোর্টহাউসের বারান্দায় বসে থাকা পুলিস অফিসারের নাম রয়েছে মেসেজে, এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে ব্যক্তিগত মন্তব্যও করেছে ঋজু। তার ধারণা, ট্রলার মাস্টার গুস্তাব গুচম্যান নিয়মিত হেরোইন পাচার করে, যদিও এবারই প্রথম ধরা পড়েছে।

ডেনমার্কের আইন ও বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সে, সংশ্লিষ্ট বিচারকের নাম উল্লেখ করে জানিয়েছে–তার ধারণা, লোকটা ঘুষ খেয়ে হেরোইন পাচারকারীদের জামিন দেয়। সলিসিটর ফন অটারম্যান সম্পর্কে লিখেছে, তার ধারণা হেরোইন ব্যবসায়ী অর্থাৎ নতুন কোন ক্রাইম সিন্ডিকেটের পোষা লোক সে। আর কোর্টহাউসের বারান্দায় বসে থাকা পুলিস অফিসার মার্কাস উলফ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছে, 'এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা আমার নাম জানল কিভাবে!'

অ্যামব্যাসাডর হোটেলের ম্যানেজারের প্রশংসা করছে ঋজু, ভদ্রলোক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাকে সাহায্যও করেছেন। ট্রলার মাস্টার গুচম্যানের পাশের কামরায় ওঠে সে। রাত দশটার দিকে নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে গুচম্যানের কামরায় নক করে। ভেতর থেকে প্রশ্ন করা হলে ঋজু গলার স্বর পাল্টে বলে, 'অটারম্যান, দরজা খোলো।' সলিসিটর কোন কারণে ফিরে এসেছেন মনে করে দরজা খুলে দেয় গুচম্যান। তাঁর বদলে ঋজুকে দেখতে পেয়ে দরজা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঋজু জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়ে–ওর হাতে পিস্তল ছিল।

গুচম্যানকে একা পেয়ে দীর্ঘ এক ঘণ্টা ইন্টারোগেট করে ঋজু। প্রথমে তার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে রাজি হয়নি গুচম্যান। বাধ্য হয়ে তার ওপর টরচার শুরু করে ঋজু, ইলেকট্রিক শক দেয়। ঋজুর যুক্তি ছিল, পনেরো কেজি হেরোইনের মালিক যে-ই হোক, এত দামী ও বিপজ্জনক জিনিস সে সাধারণ কোন ক্রুর হাতে তুলে দেবে না, দিলে ট্রলারের মাস্টারকেই দেবে। গুচম্যানকে সে জিজ্ঞেস করে, এই হিরোইন কে তাকে দিয়েছে বা কোত্থেকে সে চালানটা গ্রহণ করেছে। ইলেকট্রিক শক দিয়েও যখন কোন কাজ হলো না, ঋজু ভয় দেখিয়ে বলল যে সঠিক

জবাব না পেলে গুচম্যানকে সে গুলি করে মারবে। অবশেষে স্বীকার করল গুচম্যান, মাঝ সাগরে একটা জাপানী জাহাজ থেকে হেরোইনের প্যাকেটটা ট্রলারে তুলে দেয়া হয়। ইলেকট্রিক শক খেয়ে গুচম্যানের তখন জ্ঞান হারাবার অবস্থা। জাপানী জাহাজটার নাম তার নাকি পুরোটা স্মরণ নেই। শুধু 'টোয়েমেন' শব্দটা বলতে পারে সে। ওটা ছিল একটা অয়েল ট্যাংকার। বানট্রী বে-তে ট্রলার আর অয়েল ট্যাংকার পরস্পরের পাশে থামে। গুচম্যান চার্ট কো-অর্ডিনেটস ফলো করছিল—ফিফটি-ওয়ান নর্থ বাই টেন-টোয়েনটি-টু ওয়েস্ট; ডারসী হেড-এর ওদিকে কোথাও। এর বেশি কিছু বলতে পারেনি গুচম্যান, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তবে ঋজু বুঝতে পারে যে গুচম্যান আসলে ক্রাইম সিন্ডিকেটের সদস্য নয়, কাজটা সে করেছে ভাড়া করা ডেলিভারিম্যান হিসেবে।

এরপর নিজের কামরায় না ফিরে হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে একটা গলিতে বেরিয়ে আসে ঋজু। তার ভাড়া করা টয়োটা হোটেলের গ্যারেজেই থেকে গেছে। মেইন রোডে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নেয়। হিলটনে তার জন্যে রূম বুক করা আছে, এ-কথা ঋজু কাউকে বলেনি, তাসত্ত্বেও পিছন দিকে নজর রাখে সে। তবে না, কেউ তার পিছু নেয়নি। তারপরও মাঝ রাস্তায় ট্যাক্সি ছেড়ে দেয় সে, বাকি পথ পায়ে হেঁটে হিলটনে ঢোকে—এক্ষেত্রেও পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নেয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না।

হিলটনে নিজের রূমে বসে, রাত দেড়টায়, পোর্টেবল মিনি ফ্যাক্স মেশিনের সাহায্যে এই মেসেজ পাঠিয়েছে ঋজু। রিসেপশন ডেস্কে বসা তরুণী মেয়েটার কাছ থেকে মেশিনটা এক ঘণ্টার জন্যে ধার নিয়েছে সে, বিশ ডলার ঘুষ দিয়ে। রিপোর্ট শেষ করার পর ঋজু লিখেছে, কাল সকালের ফ্লাইটে লন্ডনে ফিরবে সে। সবশেষে ডোনাকে তার উষ্ণ ভালবাসা জানিয়েছে।

পুরো মেসেজটা আরও দু'বার পড়ল রানা, নোটবুক খুলে

কয়েকটা পয়েন্ট লিখে রাখল। চেহারায় অতি সতর্ক ভাব, কি কারণে যেন ঘাবড়ে গেছে। হাত দুটো পিছনে এক করা, ডেস্ক ছেড়ে কার্পেটের ওপর পায়চারি করছে, খেয়াল নেই স্বাতীর রেখে যাওয়া কফির কাপে একবারও চুমুক দেয়া হয়নি।

পায়চারি থামিয়ে স্কেচটা আরেকবার পরীক্ষা করল রানা, কপালে চিন্তার রেখা আরও গভীর হলো। প্রতিটি ঘটনা জ্ঞাত তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে জোড়া লাগাবার চেষ্টা চলছে মাথার ভেতর। ইরানের জিলান জেলায় পাতা ও পাপড়িবিহীন পপি খেত আবিষ্কার আর কোপেনহেগেনের উপকূলে পনেরো কেজি আনকাট হেরোইন উদ্ধার বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে না। দু'বছর হতে চলল দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় বেআইনী হেরোইন তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কৃতিত্বটা আমেরিকান স্যাটেলাইট মনিটরিং সিস্টেম-এর। দুনিয়ার যে অঞ্চলেই পপি ফল থেকে হেরোইন তৈরির কারখানা থাকুক, স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় তা ধরা পড়বে। মাটি থেকে কয়েকশো মাইল ওপর থেকে তোলা ছবি প্রিন্ট করার পর দেখতে হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর মত, যেন কেউ নানা ধরনের রঙ ছিটিয়েছে। প্রতিটি রঙের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে বস্তুর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। বিশ্লেষণ না করে শুধু ছবি দেখে হেরোইন তৈরির কারখানা বা অন্য কোন বস্তু চেনা সম্ভব নয়। এটা পপির চাষ সম্পর্কেও সত্য। বিশেষজ্ঞরা ছবি বিশ্লেষণ করে যদি বুঝতে পারে যে পপির চাষ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দেশকে তথ্যটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়া হয়। এই পদ্ধতি এতটাই সফল যে দুনিয়ার যেখানে যত বড় আকৃতির পপি খেত ছিল সব চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তারমানে অবশ্য এই নয় যে পপির চাষ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এখনও ছোট পরিসরে আফিমের চাষ হচ্ছে, তবে তা মাত্র দু'চার জায়গায়, পরিমাণেও তা অতি নগণ্য। স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় সেগুলোও

কিছু কিছু ধরা পড়ছে। কিন্তু পনেরো কেজি হেরোইন তৈরি করতে বিশাল পপি খেত দরকার। সেই খেত স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় ধরা পড়েনি কেন? কেন ধরা পড়েনি হেরোইন তৈরির কারখানা? জিলানের বিশ একর খেতটাকেও ছোট বলা যাবে না, সেটাই বা ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দিল কিভাবে? উত্তরটা পানির মত সহজ। পাপড়ি না থাকায় স্যাটেলাইট ক্যামেরায় তোলা ছবিতে পপি গাছগুলোকে চেনা যাচ্ছে না। আর হেরোইন তৈরির কারখানা ধরা না পড়ার কারণ হলো, নতুন কারখানা তৈরি করা হয়েছে সন্দেহ-মুক্ত কোন এলাকায়, স্যাটেলাইট ক্যামেরা যে এলাকার ছবি তোলে না।

বন্ধু জিম ফিশার-এর কথা মনে পড়ল রানার। আমেরিকান স্যাটেলাইট মনিটরিং সিস্টেমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সে। বন্ধুত্বটা হয় সামান্থা ফিশার, জিমের স্ত্রীর মাধ্যমে–সামান্থা এক সময় সিআইএ-র হেড অফিস ল্যাঙলিতে চাকরি করত, সে সময়কার সিআইএ চীফ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে। সিআইএ চীফ রানা এজেন্সির ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হলে সামান্থার মাধ্যমে করতেন। সেই সূত্রেই টেলিফোনে আলাপ, পরে সামনাসামনি দেখা-সাক্ষাৎ, সবশেষে নির্মল বন্ধুত্ব। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গেও রানার পরিচয় করিয়ে দেয় সামান্থা। বাংলাদেশে ঝড় বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা দেখা দিলে উপযাচক হয়ে রানাকে টেলিফোন করে আগেভাগে বেশ কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছে ফিশার। রানাও দু'একবার তার সাহায্য চেয়েছে, কোন বারই বিমুখ হয়নি।

রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা থেকে একটা ফোন এল। 'মাসুদ ভাই, ঋজুর খুন হওয়া সম্পর্কে ডেনিশ পুলিসের ভাষ্য আর ময়না তদন্তের রিপোর্ট খানিক আগে আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেছে। একটা করে কপি আমাদের অফিসে পাঠিয়েছেন মি.

বাউচার। আপনি কি এখুনি ওগুলো দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। ঋজুর রিপোর্টটা দেরাজে রেখে তালা দিল, তারপর স্বাতীকে ডেকে কমিউনিকেশন রুমে যেতে বলল। 'অফিস থেকে ফ্যাক্স আসছে, দেখো।'

স্বাতী চেম্বার থেকে বেরিয়ে যেতে ফোনের রিসিভার তুলে জিম ফিশারের নম্বরে ডায়াল করল রানা। ভাগ্য ভাল, অফিসেই পাওয়া গেল তাকে। সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে বলল, 'ফ্যাক্সে আমি একটা স্কেচ পাঠাচ্ছি, ওটা খুঁটিয়ে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে স্যাটেলাইটের ক্যামেরা কোথায় কোথায় তাক করার দরকার হবে। ফটো পাবার পর যদি সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়ে, আমাকে জানিয়ো। ঠিক আছে? সম্ভব?'

ঋজুর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মর্মাহত হলো ফিশার। নিজে তো সান্ত্বনা দিলই, আরও বলল সামান্থা রানাকে ফোন করবে। তারপর জানাল, 'অবশ্যই সম্ভব। ক্যামেরা লক করা থাকলেও, আমাদের একটা স্যাটেলাইট নর্থ সী-র ওদিকেই রয়েছে এখন। সিগন্যাল পাঠিয়ে এখুনি আমি লক খোলার ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ, জিম।'

একজোড়া ফ্যাক্স কপি নিয়ে চেম্বারে ঢুকল স্বাতী, ডেস্কে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ময়না তদন্তের রিপোর্টে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে রেখে দিল রানা—কপালে রাইফেলের গুলি খেয়ে মারা গেছে ঋজু।

পুলিসের ভাষ্যে বলা হয়েছে, গুলি খাবার সময় বেডের ওপর বসে ছিল ঋজু, খোলা একটা জানালার দিকে মুখ করে। ওই জানালার নিচে সরু একটা রাস্তা আছে, রাস্তার ওপারে সাততলা একটা বিল্ডিং। ঋজু হিলটনের সাততলার একটা কামরায় ছিল, কাজেই পুলিসের ধারণা রাস্তার ওপারের বিল্ডিঙের ছাদ থেকে

কোন স্নাইপার রাইফেল দিয়ে গুলিটা করে। তাদের আরও ধারণা, রাইফেলে অবশ্যই টেলিস্কোপ লাগানো ছিল। সরাসরি কপালে গুলি খায় ঋজু, মৃত্যু ঘটে তৎক্ষণাৎ। সবশেষে কোপেনহেগেন-এর পুলিস কমিশনার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, খুনীকে ধরার জন্যে জোর পুলিসী তৎপরতা চলছে, আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি তাকে ধরা যাবে।

কাগজ দুটো খালি একটা ফাইলে রেখে দিয়ে ডেস্ক ছাড়ল রানা। আচরণে কোন অস্থিরতা বা দিশেহারা ভাব নেই, এমনকি রাগ বা আক্রোশও নেই; তবে চোখের দৃষ্টি ক্ষুরের মত ধারাল, আর চেহারায় আশ্চর্য একটা সতর্কতা।

পরদিন সকাল ঠিক ন'টায় স্বাতীকে নিয়ে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় চলে এল রানা। পাঁচ মিনিট পর একমাত্র ডোনা ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীরাও পৌঁছুল। অফিসের পরিবেশ ভারী হয়ে আছে, কারও মুখে হাসি নেই, কথা বলছে ফিসফিস করে। ডোনা এল সাড়ে ন'টার কিছু পরে। খবর পেয়ে স্বাতী সহ তাকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠাল রানা।

ডোনা খুবই সুন্দরী, কিন্তু একরাতেই তার চেহারা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে–সারারাত না ঘুমোনোয় চোখের নিচে কালি জমেছে, কান্নাকাটি করায় ফুলে গেছে পাতাগুলো, আজ সে কোন মেকআপও ব্যবহার করেনি। কোন ভূমিকা না করে রানা তাকে বলল, 'ঋজুর ব্যক্তিগত বিষয়ে একমাত্র তুমিই সবচেয়ে বেশি জানো, ডোনা। সে যদি কোথাও কোন ভুল করে থাকে, তোমার চোখে তা ধরা পড়ার কথা।'

কথা না বলে ডোনা শুধু মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বলতে চায়, ঋজুর কোন ভুল তার চোখে ধরা পড়েনি।

'ভুল সে নিশ্চয়ই কোথাও করেছে, তুমি হয়তো তা খেয়ালও

করেছ, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে করতে পারছ না,' বলল রানা। 'আমি নিজে কেসটা তদন্ত করব। ঋজুর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলে তুমি, কাজেই তুমি আমাকে সহায়তা করবে। অর্থাৎ আজ থেকে স্বাতীর বদলে তুমিই আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

স্বাতী আর ডোনা দু'জনেই অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। নিস্তব্ধতা ভেঙে ডোনা বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ, মাসুদ ভাই। কিন্তু এত বড় দায়িত্ব আমি কি পালন করতে পারব?'

'পারো কিনা চেষ্টা করে দেখোই না।'

'জ্বী, ঠিক আছে...'

'মাসুদ ভাই,' ডোনার কথা শেষ হলো না, স্বাতী অভিমানী সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমাকে সাজা দিচ্ছেন? সামান্য একটা ভুল করেছি, তাই বলে...'

স্বাতীকে থামিয়ে দিয়ে রানা কঠিন সুরে বলল, 'তোমার ভুলটা সামান্য নয়, স্বাতী। আর, নিজের ভুল মানুষ গোপন করে রাখে, কলিগদের সামনে তা নিয়ে আলোচনা করে না।'

রানার ভাষা আর সুর শুনে সাবধান হয়ে গেল স্বাতী, আর কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

পাঁচ সেকেন্ড পর আবার বলল রানা, 'ভুল করেছ ঠিকই, কিন্তু তোমাকে কোন সাজা দেয়া হচ্ছে না। এখন থেকে তুমি এজেন্সির অফিসে ডিউটি দেবে। তবে আগের মতই, আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে। আমার নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে ডোনাকে মাঝে মধ্যে ফ্ল্যাটে ডিউটি দিতে হতে পারে, তবে কাজ শেষ করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে ও। দু'জনকেই বলে রাখছি, এ-সবই সাময়িক ব্যবস্থা। আমার হাতের কাজটা শেষ হবার পর আবার নতুন করে সব ঠিকঠাক করা হবে। আরেকটা কথা। ঢাকা থেকে ফরহাদ আসছে।' হাতঘড়ি দেখল। 'এতক্ষণে হিথরোতে ল্যান্ড করেছে ওর প্লেন। ও-ই এখন লন্ডন শাখার প্রধান হিসেবে কাজ

করবে। ডোনা?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

'আমি চাই তুমি আজ, এই মুহূর্ত থেকে কাজে মন দাও,' বলল রানা। 'ঋজুকে যারা খুন করেছে তাদের ধরতে হলে তোমাকে শক্ত হতে হবে। বিষণ্নতা বা আবেগ কাটিয়ে উঠতে না পারলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তোমার চোখ এড়িয়ে যাবে।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই, বুঝতে পারছি,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ডোনা।

'মাসুদ ভাই, আমি তাহলে এখন যাই?' চেয়ার ছেড়ে জিজ্ঞেস করল স্বাতী।

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

স্বাতী চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর রানার দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেল ডোনা, তারপর কি ভেবে চুপ করে থাকল। সে জানে, বস্ নিজে থেকে কিছু না বললে জিজ্ঞেস করাটা উচিত হবে না।

'তোমার প্রথম কাজ,' ডোনাকে বলল রানা, 'ঋজু কোনও রিপোর্ট পাঠিয়েছিল কিনা খোঁজ নেয়া।'

'পাঠালে তো দুই অফিস থেকেই জানতে পারতাম। তবু সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখি,' বলে চেয়ার ছেড়ে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল ডোনা।

ফিরতে বেশ কয়েক মিনিট সময় নিল সে, ফিরলও কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে। 'না, মাসুদ ভাই। ঋজু কোন মেসেজ বা রিপোর্ট পাঠায়নি।'

রানা কিছু বলার আগেই নক করে ভেতরে ঢুকল স্বাতী। 'মাসুদ ভাই, আইএনসিসি-তেও ফোন করেছি, এখানেও ঋজুর কোন রিপোর্ট আসেনি।'

'তোমাদের সিরিয়াস হতে দেখে আমি খুশি,' ম্লান হেসে বলল

রানা। 'ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের কাজ করো।'

বেলা বারোটার দিকে ডীন র‍্যাদারফোর্ড আর উলরিখ বাউচার রানার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ওঁদেরকে রানার চেম্বারে নিয়ে এল ফরহাদ, সঙ্গে ডোনাও রয়েছে। এর আগে ফরহাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ নিভৃতে আলোচনা করেছে রানা।

হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দায়িত্ব রানা এজেন্সির ডিরেক্টর স্বয়ং নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, সেজন্যে পরম স্বস্তিবোধ করছেন উলরিখ বাউচার, বিনয়ে রীতিমত গদগদ হয়ে উঠলেন তিনি। কমিশনার ডীন র‍্যাদারফোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে সহানুভূতি জানাতে এসেছেন, তবে প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, জাতিসংঘের একটা সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্যে আজই তাঁর নিউ ইয়র্কে যাবার কথা। তারপর বললেন, 'মি. মুর্তজার খুন হয়ে যাওয়াটাকে আমরা কেউ হালকাভাবে নিতে পারি না। এখানে আমাকে যদি আপনার প্রয়োজন হয়, সেমিনারে আমি যাব না।'

'না-না, আপনি যান,' বলল রানা। 'প্রয়োজন হলে মি. বাউচারকে তো আমি পাবই।'

র‍্যাদারফোর্ড গম্ভীর সুরে বললেন, 'মি. মুর্তজা কোন রিপোর্ট পাঠাননি, এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে নিচ্ছেন, মি. রানা?'

'ঋজু কোন রিপোর্ট না পাঠালেও, অন্য সূত্র থেকে প্রচুর তথ্য পেয়েছি আমি।'

র‍্যাদারফোর্ড ও বাউচার নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর র‍্যাদারফোর্ড জানতে চাইলেন, 'কেসটা সম্পর্কে আপনার প্রাথমিক ধারণা কি?'

'একটা কথা পরিষ্কার,' বলল রানা। 'কোথাও থেকে কেউ একজন নতুন হেরোইন নেটওঅর্ক পরিচালনা করছে।' এ-প্রসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল ও, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন

কথাগুলো। পপির ছোট-বড় সমস্ত আবাদযোগ্য এলাকা হপ্তায় অন্তত একবার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মনিটর করা হয়, ক্যামেরাকে ফাঁকি দিয়ে একশো পঞ্চাশ কিলোগ্রাম আফিম তৈরি করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। পনেরো কিলো হেরোইন তৈরি করতে ওই পরিমাণ আফিমই লাগে। আর দেড়শো কিলো আফিম তৈরি করতে হলে বাহান্ন একর জমিতে পপির চাষ করতে হবে। ঋজুর পাঠানো স্কেচটা আগেই ফটোকপি করে রেখেছিল, ওঁদেরকে দেখাল রানা। ট্রলার মাস্টার গুচম্যান সম্পর্কেও কিছু তথ্য দিল। আয়ারল্যান্ডের উপকূলের কাছাকাছি কোথাও জাপানী একটা অয়েল ট্যাংকার থেকে হেরোইনের চালানটা গ্রহণ করে সে। এখন প্রশ্ন হলো, ডেনিশ নেভি যে পনেরো কিলো হেরোইন উদ্ধার করেছে তা কি পাপড়িবিহীন পপি ফল থেকে তৈরি? তা যদি হয়, তাহলে ইরানের পপি খেত আর চার হাজার মাইল দূরের নর্থ ইউরোপিয়ান কোস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগটা কোথায়?

রানা থামতে র‍্যাদারফোর্ড মাথা নাড়লেন। 'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা বলেই মনে হয়, কোন সম্পর্ক নেই।'

'সম্পর্ক নেই, আবার আছেও,' বলল রানা। 'আমেরিকান স্যাটেলাইট মনিটরিং সিস্টেম থেকে আমরা যেহেতু কোন তথ্য পাচ্ছি না, কাজেই ধরে নিতে হবে পাতা ও পাপড়িবিহীন পপি খেত ক্যামেরায় ধরা পড়ছে না। নতুন হেরোইন নেটওঅর্কের হোতারাও ব্যাপারটা জানে, তাদের পপি খেত স্যাটেলাইটে ধরা পড়বে না। এর মানে হলো, নির্দিষ্ট কোন একটা জায়গায় নয়, দুনিয়ার আরও বহু জায়গায় নতুন প্রজাতির এই পাপড়িবিহীন পপির চাষ ব্যাপক হারে শুরু হয়ে গেছে।'

'এ তো মাথা খারাপ হবার অবস্থা, স্যার,' বললেন বাউচার। 'আমি তো বুঝতেই পারছি না আপনি কোত্থেকে তদন্ত শুরু করবেন।'

আয়ারল্যান্ড থেকে,' বিড়বিড় করল রানা। 'অন্তত স্কেচটা ওদিকেই যেতে বলছে আমাকে।'

পরদিন রোববার, অফিস বন্ধ, তারপরও সারাদিন নিজের ফ্ল্যাটে বসে কাজ করেছে রানা। প্রথম বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফোন করে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান অর্থাৎ ওর বসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছে। সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দেয়ার পর জানতে চেয়েছে, ইরানী মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ আজমল আফসানজানি যেহেতু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওখানকার আর্মি কর্নেল নূর বেলালী ইয়াজদানীর ওপর কড়া নজর রাখার অনুরোধ করা ওঁর পক্ষে সম্ভব কিনা। রাহাত খান জানিয়েছেন, খুবই সম্ভব। রানা তাঁকে বলল, ঋজুকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি ইয়াজদানী–পপি বীজ বা গাছ লন্ডনে এখনও পাঠায়নি সে।

দ্বিতীয় ফোনটা করল রানা এজেন্সির কোপেনহেগেন শাখার প্রধান শাইখকে। সলিসিটর ফন অটারম্যান আর ডেনিশ পুলিস অফিসার মার্কাস উলফ-এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। তবে না, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন অ্যাকশন নেয়ার দরকার নেই। গুন্থার গুচম্যান সম্পর্কে নির্দেশ দিল, 'ডেনমার্কে সে আছে বলে মনে হয় না, তবু যদি খুঁজে পাও, ধরে এনে আমাদের সেফ হাউসে আটকে রাখবে।'

সোমবার সারাদিন অফিস করার পরও রাতে ফ্ল্যাটে ফিরে ফাইল-পত্র নিয়ে বসেছে রানা। ডোনার সঙ্গে কমিউনিকেশন রূমে রয়েছে স্বাতী, ডোনাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। কাজটা শেষ হতে দু'জনেই ওরা রানার চেম্বারে ঢুকল, ঠিক এই সময় ডেস্কের ওপর বেজে উঠল স্যাটেলাইট ফোনটা। কাছাকাছি ছিল স্বাতী, সে-ই রিসিভার তুলল।

'মাসুদ ভাই, ওয়াশিংটন থেকে মি. জিম ফিশার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

স্বাতীর হাত থেকে রিসিভারটা নিল রানা। 'ফোন যখন করেছ, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল কোন খবর দেবে। বলে ফেলো, টেপ অন করাই আছে।'

'তাড়াতাড়ি অফ করো। ব্যাপারটা কনফিডেনশিয়াল,' ওয়াশিংটন থেকে বলল ফিশার।

ক্যাসেট বন্ধ করে টেলিফোন জ্যাকটা খুলে নিল রানা। 'করলাম অফ। এবার বলো।'

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি। পশ্চিম আয়ারল্যান্ডে কোন অয়েল রিফাইনারী আছে কিনা জানো?'

'এটা কি ধরনের প্রশ্ন হলো?'

'আছে কিনা?' ফিশারের গলার সুরে জরুরী তাগাদা।

মাথা চুলকাল রানা। 'আমার অন্তত জানা নেই। ওদিকটা তো বেশিরভাগই এগ্রিকালচারাল এরিয়া। বান্ট্রী বে-র দিকে দু'একটা থাকতে পারে, কিন্তু পশ্চিমে বোধহয় নেই...'

'স্বর্গ থেকে পাঠানো একটা ফটো-রিপোর্ট রয়েছে আমার টেবিলে,' বলল ফিশার। 'তাতে দেখা যাচ্ছে কাউন্টি কেরী-র মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিক হাইড্রাইড-এর অস্তিত্ব আছে।'

'এক মিনিট,' বলে ডোনার দিকে তাকাল রানা। 'কমিউনিকেশন রূম থেকে আয়ারল্যান্ডের ম্যাপটা নিয়ে এসো।' দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ম্যাপ নিয়ে ফিরে এল ডোনা। 'হ্যাঁ, জিম, ম্যাপ পেয়েছি–লোকেশনটা পিন-পয়েন্ট করো দেখি।'

'এখুনি পিন-পয়েন্ট করা সম্ভব নয়,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল ফিশার। 'অ্যাসিটিক হাইড্রাইভ-এর অস্তিত্ব ওখানে ধরা পড়েছে অ্যাক্সিডেন্টালি। আমি শুধু তোমাকে এটুকু জানাতে পারি, শ্যানন-

এর মোহ্না থেকে ট্রালী বে-র মাঝখানে কোথাও জায়গাটা। ফটো-রিপোর্টের কপিগুলো আজই ফ্যাক্স করে পাঠাচ্ছি তোমাকে। আমাকে যেটা হতভম্ব করে তুলেছে, ওখানে অ্যাসিটিক হাইড্রাইড আসে কোত্থেকে?'

'তোমাদের স্যাটেলাইট ক্যামেরা কিভাবে কাজ করে তাই তো আমি জানি না, তোমার প্রশ্নের জবাব দেব কিভাবে?' বিরক্ত বোধ করছে রানা।

'স্যাটেলাইটে শুধু ক্যামেরা নয়, সঙ্গে সেনসর আর কমপিউটরও আছে–জমিন থেকে ছয়শো মাইল ওপরে। সিস্টেমটা অত্যন্ত জটিল, রানা। স্পেইসওয়াচ-টু সিস্টেম টপ সিক্রেট প্রজেক্ট, কাজেই তোমাকে খুঁটিনাটি সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করতেও পারছি না। শুধু এটুকু বলি, ডায়ামিটারে ছয় ফুট বা তার চেয়ে বড় কোন বস্তুই শুধু আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এই প্রজেক্টের মূল কাজ নিউক্লিয়ার টেস্ট ও কেমিকেল টেস্ট মনিটরিং করা, আর সন্দেহের তালিকায় যে-সব এলাকা আছে সে-সব জায়গায় পপির চাষ হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করা।'

'মাফ করো, এত সব কথা আমার জানার ধৈর্য বা সময়, কোনটাই নেই,' বলল রানা। 'তুমি শুধু ব্যাখ্যা করো, অ্যাসিটিক হাইড্রেড-এর সঙ্গে পপি বা হেরোইনের কি সম্পর্ক?'

'শুধু তিনটে ক্ষেত্রে অ্যাসিটিক হাইড্রেড ব্যবহার করা হয়,' বলল ফিশার। 'অয়েল রিফাইন করতে লাগে। মেটাল প্রসেসিং-এও দরকার হয়। আর লাগে মরফিনকে হেরোইনে রূপান্তর করার কাজে।'

তথ্যটা হজম করছে রানা, কথা বলছে না।

'পশ্চিম আয়ারল্যান্ডে হেভি কোন ইন্ডাস্ট্রি নেই, অন্তত আমার জানামতে নেই,' আবার বলল ফিশার। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, আয়ারল্যান্ডে কেন কেউ হেরোইন তৈরি করতে যাবে? কোন

যুক্তিতেই তো মেলে না। ইউরোপের কোথাও পপির চাষ হয় না। আয়ারল্যান্ডে হেরোইন তৈরি করতে হলে নর্থ আফ্রিকা বা এশিয়া থেকে আফিম আমদানী করতে হবে, কারণ মধ্যপ্রাচ্যের খেতগুলো দু'বছর আগেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, ইন্দো-চায়নাতেও পপির চাষ এখন আর হচ্ছে না। সমস্যাটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল মনে হচ্ছে, রানা।'

'জটিল তো বটেই, তবে তুমি আমার খুব বড় একটা উপকার করেছ–অসংখ্য ধন্যবাদ, জিম,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। 'যদি কখনও কোন উপকার দরকার হয়, জানাতে ভুলবে না। রাখি।' যোগাযোগ কেটে দিল।

প্রথমে ডোনা, তারপর স্বাতীর দিকে তাকাল রানা। 'ফিশার বলছে, পশ্চিম আয়ারল্যান্ডে খোঁজ নিলে পনেরো কিলো হেরোইন কোত্থেকে এল তার সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

'আয়ারল্যান্ডে?' স্বাতী ও ডোনা একযোগে জানতে চাইল, দু'জনেই প্রায় হতভম্ব।

'হ্যাঁ।' রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল রানা। 'আইরিশ কনসালে যোগাযোগ করে খোঁজ নাও ওদিকে কোন অয়েল রিফাইনারী আছে কিনা–ওয়েস্ট কোস্টে, শ্যানন এয়ারপোর্ট আর বান্ট্রী বে-র মাঝখানে, উপকূল থেকে ভেতরের দিকে...' চোখ নামিয়ে ম্যাপের দিকে তাকাল, '...লিমেরিক পর্যন্ত। কালকের ফ্লাইটের একটা টিকেটও বুক করো, ওখানে আমি যাচ্ছি।'

'মাসুদ ভাই, মি. বাউচারকে জানাবেন না?' জিজ্ঞেস করল ডোনা।

'ওঁরা ওঁদের পদ্ধতিতে তদন্ত করছেন, আমরা আমাদের পদ্ধতিতে,' বলল রানা। 'তবে প্রয়োজন হলে অবশ্যই আইএনসিসি-র সাহায্য চাইব আমরা।'

স্বাতী বলল, 'কিন্তু মাসুদ ভাই, অয়েল রিফাইনারীর সঙ্গে

হেরোইনের কি সম্পর্ক?'

'আমারও সেই প্রশ্ন, মাসুদ ভাই,' বলল ডোনা। 'যদি অয়েল রিফাইনারী পাই, তারপর কি খুঁজতে হবে জানব কিভাবে?'

হেসে ফেলল রানা। 'হেরোইনের সঙ্গে অয়েল রিফাইনারীর সম্পর্ক বুঝতে হলে স্পেইসওয়াচ সিস্টেম কিভাবে কাজ করে, প্রথমে সেটা বুঝতে হবে। এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব নয়।'

স্বাতী বলল, 'আমি জানি আমেরিকানদের স্পেইসওয়াচ সিস্টেম হাইলি ক্লাসিফায়েড, কিন্তু আপনি যখন জানেন, আমার জানতে অসুবিধে কি? রানা এজেন্সিতে আমার এ-প্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স আছে।'

'বন্ধুত্বের খাতিরে জিম ফিশার তাদের একটা রাষ্ট্রীয় প্রজেক্টের গোপন তথ্য আমাকে জানিয়েছে,' বলল রানা। 'সেটা আমি সবাইকে জানিয়ে দিলে তার সঙ্গে বেঈমানী করা হয়, তাকে বিপদেও ফেলা হয়। একটু ধৈর্য ধরো, আমেরিকানরা তাদের এই প্রজেক্টের সমস্ত তথ্য ইন্টারনেটে পাঠাবে, তখন জেনে নিয়ো। দু'জনকেই বলছি, জিমের সঙ্গে আমার কি নিয়ে আলাপ হয়েছে তা যেন আর কেউ না জানে।'

ডোনা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিল। কিন্তু স্বাতীর চেহারা লালচে হয়ে উঠল, সম্ভবত অপমানেই। এর আগে আরও অনেক গোপনীয় ও বিপজ্জনক তথ্য তাকে জানাতে দ্বিধা করেনি রানা, আজ হঠাৎ এমন কি হলো যে…

তিন

পরদিন গভীর রাতে প্যান অ্যাম সেভেন-নাইন-সেভেন রানাকে নিয়ে ল্যান্ড করল শ্যানন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। আকাশে ঘন মেঘ, যে-কোন মুহূর্তে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি শুরু হবে। হাতে সময় নেই, ডাবলিনগামী শেষ শাটল ফ্লাইট ধরার জন্যে ছুটতে হলো ওকে।

লন্ডন ত্যাগ করার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছে, চাইলেও ভুলে থাকতে পারছে না রানা। হিথরোর উদ্দেশে রওনা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ও, কাঁধে ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল স্বাতী। 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

স্বাতী মাথা নিচু করে জবাব দিল, 'যত দিন আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলাম, এই ফ্ল্যাটে আমার থাকার একটা যুক্তি ছিল। আমি আমাদের অফিসের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি।'

ডোনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যা ভাল মনে করো। তবে এখানে যে দু'জন গার্ড আছে ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তোমার নতুন ফ্ল্যাট পাহারা দেবে ওরা।' তারপর ডোনার দিকে ফিরে বলল, 'কথাটা তোমার বেলাও সত্যি। ইচ্ছে করলে নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে চলে আসতে পারো তুমি।'

ডোনা কিছু বলার আগেই বিদায় নিয়ে চলে গেল স্বাতী।

ম্লান মুখে ডোনা বলল, 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। ফ্ল্যাটটা

খালি পড়ে থাকবে, তারচেয়ে আমিই এসে থাকি।'

'গুড।'

ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু ভুলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

ডাবলিন এয়ারপোর্টে বৃষ্টির মধ্যে ল্যান্ড করল প্লেন। ঋজু যেমন ডোনার দায়িত্ববোধ আর দক্ষতা সম্পর্কে সন্তুষ্টবোধ করেছিল, রানাকেও করতে হলো। রেন্ট-আ-কার কোম্পানীর রেইনকোট পরা একজন প্রতিনিধি ছাতা হাতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল, রানাকে নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটা দেখিয়ে দিল। তার কাছ থেকে ডোনার একটা মেসেজও পেল ও, ডাবলিন ইন্টারকন-এর একটা কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে ওর নামে। ডাবলিন শহরে আগেও কয়েকবার এসেছে রানা, রাস্তা-ঘাট সব চেনা। অনেক রাত হয়েছে, তার ওপর ঝম-ঝম বৃষ্টি, সাবধানে গাড়ি চালিয়ে হোটেলে এসে উঠল ও।

পরদিন সকালে ডোনা ফোন করে জানাল, আইরিশ রিপাবলিক-এর নারকটিক সমস্যা নিয়ে যিনি মাথা ঘামান, কাস্টমস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জ্যাক ফেরি-র সঙ্গে রানার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে সে সকাল সাড়ে ন'টায়। কথা শেষ করে হাসতে শুরু করল ডোনা।

'হাসছ কেন?'

'ভদ্রলোক আমাকে রীতিমত ধমক মেরেছেন,' বলল ডোনা। 'বললেন, রানা আর আমি ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিতে একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছি, ওর সঙ্গে আমার বিশ বছরের বন্ধুত্ব, দেখা করার জন্যে সে তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলেছে? আসুক শালা!'

রানাও না হেসে পারল না। বলল, 'তোমারই ভুল। আমি কি তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলেছিলাম?'

ডোনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'আমি কি আর জানতাম নাকি যে

আপনারা পুরানো বন্ধু!'

ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিতে ট্রেনিং নেয়ার পর আয়ারল্যান্ড নেভিতে কমোডর হয়েছিল জ্যাক ফেরি। উপকূল এলাকায় স্মাগলারদের নেটওঅর্ক ধ্বংস করায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় সে, ফলশ্রুতিতে এক সময় নেভি থেকে তুলে এনে কাস্টমসে চাকরি দেয়া হয় তাকে, বর্তমানে কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদে দায়িত্ব পালন করছে।

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় কাস্টমস হাউসে পৌছুল রানা। বারোতলা বিল্ডিঙের পাঁচতলায়, নিজের অফিসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল জ্যাক ফেরি। মুখে 'আসুক শালা' বললেও, রানাকে দেখামাত্র বুকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানাল। 'যোগাযোগ রাখো, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ তো হয় না–তুমি তো দেখছি এখনও ছাব্বিশ বছরের তরুণ হয়ে আছ। রহস্যটা কি, বয়েস বাড়ে না কেন?'

নিজেকে অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে বন্ধুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল রানা। 'আমি তো জানি তুমি ঘুষ খাও না, তাহলে এত মোটা হলে কিভাবে?'

রানার অভিযোগ মিথ্যে নয়, ছ'ফুট লম্বা জ্যাক ফেরির ওজন খুব কম করেও আড়াই মন হবে। হাসল সে, বলল, 'মোটা হয়েছি শুয়োর খেয়ে–জানোই তো, শুয়োরের মাংসে চর্বি বেশি থাকে। আছ কেমন, দোস্ত? এজেন্সির কাজ কেমন চলছে? সেনাবাহিনীর চাকরি না ছাড়লে এতদিনে কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল হয়ে যেতে–আফসোস হয় না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি যা হতে চেয়েছিলাম তাই হতে পেরেছি, কাজেই কোন আফসোস নেই। কথাটা বোধহয় তোমার বেলায়ও সত্যি।'

'হ্যাঁ, আমিও নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট,' হাত ধরে টেনে

এনে সোফায় বসাল রানাকে। 'কি খাবে বলো। তোমার তো আবার দিনে হুইস্কি চলে না। কফি বলি?'

'বলো।'

বেল বাজাল ফেরি, সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বসনা যে মেয়েটি ভেতরে ঢুকল তাকে দেখে অস্বস্তিবোধ করল রানা, চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। 'আমার সেক্রেটারি, নিকোল। নিকোল, দু'কাপ কফি।'

নিকোল চলে যেতে ফেরি বলল, 'তারপর বলো। উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব ঝালাই করা নয়। তুমি কোনও কাজে এসেছ।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, তারপর কি কি ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিল।

রানা থামতে কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ফেরি। তারপর বলল, 'অদ্ভুত কথা শোনালে! পাপড়িবিহীন পপি ফুল? তা কিভাবে সম্ভব?'

মনে মনে আহত বোধ করল রানা, ঋজুর মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রথমেই ফেরির দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল না? 'কিভাবে সম্ভব জানি না, তবে কথাটা সত্যি।'

ফেরিকে এখনও বিস্মিত দেখাচ্ছে। 'কিন্তু তুমি আয়ারল্যান্ডে কেন এসেছ?'

'শুনতে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক,' বলল রানা, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আয়ারল্যান্ডে একটা হেরোইন প্রসেসিং ল্যাবরেটরি আছে।'

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল ফেরি। কঠিন সুরে কিছু বলতে যাবে রানা, ট্রে হাতে নিকোলকে ভেতরে ঢুকতে দেখে নিজেকে সামলে নিল। ডেস্কের ওপর ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। ফেরি তখনও হাসছে।

'তোমার হাসির আমি কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না, জ্যাক,' বলল রানা। 'আমাকে তুমি চেনো, জানো তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কোন

কাজে হাত দিই না। আয়ারল্যান্ডের কাছাকাছি একটা জাপানী জাহাজ থেকে ট্রলার মাস্টার গুচম্যান পনেরো কিলো হেরোইন পেয়েছে। এদিকে তাকে আসতে হওয়ায় ডেনমার্কে পৌছুতে দু'দিন বেশি সময় লেগেছে তার।'

'এ-সবই তোমার অনুমান,' ফেরি বলল। 'তথ্য-প্রমাণের কথা বলছ, সেগুলো কি? সেগুলোর উৎসই বা কি?'

'সেগুলো টপ সিক্রেট, সময় হলে তোমাকে জানাব,' জবাব দিল রানা। 'ঠিক আছে, ধরে নাও আমি অনুমান বা সন্দেহ করছি, কিন্তু তাতে যুক্তি নেই এ-কথা তুমি বলতে পারবে না।'

'যেমন?'

'ধরা যাক পাপড়িবিহীন পপি চাষ করতে সফল হয়েছে কেউ, যা কিনা স্পেইসওয়াচ সিস্টেমে ধরা পড়বে না। এবার বলো, চাষ করার জন্যে এই অঞ্চলের কোন এলাকাটা তারা বেছে নেবে? ইউরোপ সন্দেহ-মুক্ত এলাকা, স্পেইসওয়াচ সিস্টেমের স্যাটেলাইটগুলো এদিক দিয়ে যাবার সময় ক্যামেরা লক করে রাখে। আয়ারল্যান্ড আন্ডারডেভ্‌লপ্‌ড্‌ কান্ট্রি, তোমাদের বেশিরভাগ এলাকা দুর্গম–গভীর বনভূমি আর পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই, কোন কোন জায়গায় জনবসতিও না থাকার মত। আমি তো বলব পপি চাষের জন্যে আয়ারল্যান্ড দুনিয়ার সবচেয়ে আদর্শ জায়গা।'

মাথা নাড়ল ফেরি। 'তোমাকে অপমান করা হবে, তাই হাসছি না। তবে এ-কথাও না বলে পারছি না যে তুমি প্রলাপ বকছ, রানা। দুঃখিত, ভাই–তুমি ভুল দরজায় নক করছ।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ফেরিকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। ফেরি বারবার একই প্রশ্ন করছে, তুমি যে তথ্য-প্রমাণের কথা বলছ তা একা শুধু তুমি জানো, পুলিস কেন জানে না? তাছাড়া, তুমি তোমার তথ্যের উৎসও আমাকে বলছ না।'

রানাকে তখন বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো, আমি তাহলে জাতিসংঘকে আইএনসিসি-র ফোর্স পাঠাতে অনুরোধ করব।'

এতক্ষণে একটু নরম হলো কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। 'যদি ধরেও নিই তোমার সন্দেহ সত্যি, হেরোইন প্রসেসিং ল্যাবরেটরিটা কোথায় রয়েছে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইল সে।

'সন্দেহজক লোকেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অ্যাবিফিয়াল-এর দক্ষিণে বড়সড় একটা ভিনিয়ার্ডকে।'

ফেরিকে হতভম্ব দেখাল। 'রানা! রানা! সত্যি তুমি প্রলাপ বকছ! আয়ারল্যান্ডে ভিনিয়ার্ড? প্রশ্নই ওঠে না, কারণ স্থানীয় ওয়াইন ইন্ডাস্ট্রি বলে আয়ারল্যান্ডে কিছু নেই, কোন কালে ছিলও না।'

'তথ্যটা পেয়ে আমারও তোমার মত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, জ্যাক,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু ভেবে দেখো, ওয়াইন তৈরি করার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, প্রতিটি ওয়াইন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী তাদের পদ্ধতি ট্রেড সিক্রেট হিসেবে গণ্য করে, কাজেই কড়া সিকিউরিটি সিস্টেম অপ্রত্যাশিত নয়।

'প্লেনে বসে কয়েকটা জার্নাল পড়েছি আমি, জানতে পেরেছি আয়ারল্যান্ডে এমন একটা ফার্ম আছে, যারা বড় আকৃতির বেশ কয়েকটা ভিনিয়ার্ডের মালিক। শুধু তাই নয়, ওগুলোয় বিশাল শেড আর বিল্ডিংও আছে—প্রসেসিং প্ল্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।'

গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছে জ্যাক ফেরি। 'তুমি দেখছি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলে। স্বীকার করছি, তোমার সন্দেহের পিছনে যুক্তি আছে।'

'সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিতে পারি তুমি ব্যাপারটা তদন্ত করে

দেখবে?'

'কথা দিতে পারছি না, কারণ এ-ধরনের অভিযোগ তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিসের, কাস্টমসের নয়।'

'পুলিসের সাহায্য চাই না বলেই তো তোমার কাছে এসেছি আমি,' বলল রানা। 'পুলিস অ্যাকশন নিতে এত দেরি করে, অ্যাকশনে যাবার আগে এত হৈ-চৈ করে, লোকেশনে পৌঁছুবার পর দেখা যায় সব ফাঁকা, কিচ্ছু নেই। আমি চাই, কাস্টমসের পক্ষ থেকে গোপনে একটা তদন্ত চালাও তুমি। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে এটুকু ক্ষমতা তোমার নেই?'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো ফেরি। 'বন্ধুত্বের খাতিরে এটুকু অন্তত করতে পারি। আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন লোককে দিয়ে গোটা ডিস্ট্রিক্টেই তল্লাশী চালাবার ব্যবস্থা করছি। ঈশ্বরই বলতে পারেন কিছু পাওয়া যাবে কিনা।'

'কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, তুমি তদন্ত করতে রাজি হয়েছ, এতেই আমি খুশি।' রানাকে সন্তুষ্ট দেখাল।

ঘড়ির কাঁটা ধরে সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটার সময় হিথরোতে নামল প্লেন।

স্যাব গাড়িটা নিয়ে রানার জন্যে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করার কথা ডোনার। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রানার, একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরল। গার্ড দু'জনকে পাঠানো হয়েছে স্বাতীর নতুন ফ্ল্যাট পাহারা দেয়ার জন্যে, কাজেই ডোনা এখানে আছে কিনা জিজ্ঞেস করার জন্যে কাউকে পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাটের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ও, দরজা বন্ধ করে চলে এল সরাসরি নিজের চেম্বারে। হাতের ব্রীফকেসটা ডেস্কে রেখে ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিল।

ডোনা সাড়া দিচ্ছে না।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। প্রথমে ফ্ল্যাটের নিজের অংশটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। সবগুলো দরজা আর জানালা অক্ষত, অনধিকার প্রবেশের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। তারপর কাঁচ দিয়ে ঘেরা পার্টিশনের সামনে এসে দাঁড়াল, ওপারে ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় অংশ–স্বাতীর বদলে এখন যেখানে ডোনার থাকার কথা।

সাবধানে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। প্রথমে কোন ঘরে ঢুকল না, করিডর ধরে চলে এল ফ্ল্যাটের পিছনের অংশে। কিচেনের একটা জানালার কাঁচ ভাঙা দেখে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। প্রথমে গ্রিল খোলা হয়েছে, কাঁচ ভাঙা হয়েছে পরে। ওর অনুপস্থিতিতে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল কেউ। একজন বা কয়েকজন। কেন? ডোনা কোথায়?

ডোনাকে ফ্ল্যাটের কোথাও পাওয়া গেল না। শুধু বেডরুমে তার ছেঁড়া একটা ব্লাউজ দেখতে পেল রানা, কলারে সামান্য শুকনো রক্ত লেগে আছে। ব্রেস্ট পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা একটা কাগজ। হাতে নিয়ে সেটার ভাঁজ খুলল রানা।

'ডোনা জেফরিকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেতে হলে আমাদের সঙ্গে আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে। আজ রাত ন'টার মধ্যে নিচের নম্বরে টেলিফোন করুন, তা না হলে মর্গে কাল তার লাঁশ দেখতে পাবেন।'

ধীরে ধীরে বিছানার ওপর বসে পড়ল রানা। খালি হাতটা দিয়ে দু'চোখ ঢেকে চিন্তা করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শিরদাঁড়া খাড়া করে হাতঘড়ি দেখল। আটটা পনেরো।

পিস্তলটা শোল্ডার হোলস্টারে গুঁজে রাখল রানা, চেম্বারে ফিরে এসে ফোনের রিসিভার তুলল, কাগজে লেখা নম্বর দেখে ডায়াল করল ধীরে ধীরে।

ক্রেড্‌ল থেকে রিসিভার তোলার শব্দ হলো ক্লিক করে.

তারপর শোনা গেল ভারী ও কর্কশ একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'মি. মাসুদ রানা?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করছে রানা, গলাটা চেনে কিনা। সময় নষ্ট করাটাও উদ্দেশ্য, লোকটাকে এক মিনিট লাইনে ধরে রাখতে পারলে কলটা ট্রেস ব্যাক করা সম্ভব হবে।

অপরপ্রান্ত থেকে লোকটা হাসল। 'আমরা প্রফেশনাল, মি. রানা। কোন রকম চালাকি করে পার পাবেন না—ডোনা খুন হয়ে যাবে। জবাব দিন।'

'বলছি,' রানার গলা শুকনো কাঠ।

'বেশ, মন দিয়ে শুনুন তাহলে। আশা করি আপনার নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারির ছেঁড়া ব্লাউজটা ইতিমধ্যে আপনার চোখে পড়েছে?'

রানা জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'বুঝলাম, রাগে কথা বলতে পারছেন না। তবে আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা আপনার সঙ্গে খেলতে নামিনি। মেয়েটার বাঁচার একটাই মাত্র উপায় আছে।'

'আমরা কারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোন প্রশ্ন নয়, মি. রানা। কি নির্দেশ দিই মন দিয়ে শুনুন। ঠিক সাড়ে ন'টায় ফ্ল্যাট থেকে বেরুবেন আপনি, নিজের গাড়ি নিয়ে সোজা রাসেল স্কয়্যার-এ চলে আসবেন। বেডফোর্ড ওয়ে-র কোণে থামবেন, বাগানে ঢুকবেন উত্তর-পুবদিকের গেট দিয়ে—সরাসরি চিলিস হোটেলের উল্টোদিকে ওটা। যা যা বললাম, মনে থাকবে?'

কথাগুলো ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'সময় শেষ, যোগাযোগ কেটে দিচ্ছি,' দ্রুত বলল লোকটা। 'তবে এখুনি আবার ফোন করছি আমি।'

কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

ডেস্কের ওপর তিনটে ফোন। রানা অপেক্ষা করছে। পাঁচ মিনিট পর রিঙ হলো। তিনটের মধ্যে যেটা বাজল, রানা আশা করেনি ওটা বাজবে। রিসিভার তুলল, কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলল না।

'মি. রানা?'

'বলছি।'

'প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। ফোয়ারার কাছে আপনার জন্যে এক লোক অপেক্ষা করবে। গায়ে থাকবে কালো রেইনকোট। নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে রওনা হবেন আপনি।'

'কেন?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল রানা।

'আপনার সঙ্গে খুব জরুরী আলাপ আছে আমাদের।'

'প্রথমে আমি ডোনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তা না হলে...'

'এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে একটা ধারণা দিন আমাকে,' বলল রানা।

'এখানে পৌঁছুলেই সব জানতে পারবেন, মি. রানা। আবার আশ্বাস দিচ্ছি, প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলুন, আপনার বা ডোনা জেফরির কোন ক্ষতি হবে না। সাড়ে ন'টায় ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাসেল স্কয়্যারে পৌঁছান ঠিক দশটায়। কোথাও ফোন করবেন না, আসার পথে কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি এখানে সময় মত না পৌঁছুলে মেয়েটাকে সাড়ে দশটায় খুন করা হবে, হানড্রেড পার্সেন্টি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

লোকগুলোর পরিচয় যা-ই হোক, ডোনা যে এখন তাদের

কাছে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরিচয় সম্পর্কেও রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, ওরা আয়ারল্যান্ডের নারকোটিক সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। ডোনা বেঁচে আছে, কারণ ওকে ফাঁদ পেতে ধরার জন্যে টোপ হিসেবে মেয়েটাকে ওদের দরকার। ওকে রাসেল স্কয়্যারে যেতে বলা হয়েছে। ওখানে কেন? ইচ্ছে করলে এই ফ্ল্যাটেই ওর জন্যে অপেক্ষা করতে পারত ওরা। ব্লাউজ আর চিরকুট রেখে যাবার জন্যে জানালা ভেঙে ভেতরে তো ঢুকেই ছিল। লন্ডন শহরের একটা চৌরাস্তায় রহস্যময় রদেভোঁর আয়োজন করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? এর মানে কি ওরা অপেক্ষা করে দেখতে চায় ও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে কিনা? সেক্ষেত্রে বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে, ও বেরুলে পিছু নেবে। ফোনগুলোর লাইনেও নিশ্চয় আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে।

একে একে সবগুলো ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। একটাতেও ডায়াল টোন নেই। আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করার ঝামেলায় যায়নি, সবগুলো ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে। এখন আর কোন সন্দেহ নেই, কাছাকাছি কোথাও থেকে ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করল রানা। কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কিভাবে পাতা হবে ফাঁদটা। রাসেল স্কয়্যারে একটা মঞ্চ সাজানো হবে, সেই মঞ্চে যে নাটকটা অভিনীত হবে তাতে অভিনয় করবে ডোনা আর ও।

ঋজু মারা যাবার পর ডোনাকে প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে তুলে এনেছে ও। ঋজুকে ডোনা ভালবাসত, কাজেই সে মারা যাবার পর এত তাড়াতাড়ি রানা যদি প্রেম নিবেদন করে বা অন্যায় কোন প্রস্তাব দেয়, তীব্র প্রতিবাদ করবে ডোনা। এই কাল্পনিক গল্পের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হবে

নাটকটা, পরিণতিতে পাওয়া যাবে দুটো লাশ। একটা খুন, অপরটা আত্মহত্যা। কিংবা পুলিস হয়তো একটা লাশ পাবে, আলামত দেখে বুঝতে পারবে দ্বিতীয় লাশটা গুম করে ফেলা হয়েছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। দশটায় পৌঁছুতে বলেছে ওরা, এখন বাজে সাড়ে আটটা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে রিভলবারটা আরেকবার চেক করে নিল। লোড করা আছে, খালি সিলিন্ডারে বিশ্রাম দিচ্ছে হ্যামার। দেরাজের তালা খুলে পকেটে বারোটা কার্ট্রিজ ভরল।

চেম্বার থেকে ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় অংশে চলে এল রানা, বাথরূমে ঢুকে কাবার্ডটা খুলল। স্বাতী এখানে কিছু কাপড়চোপড় আর টয়লেট আর্টিকেল রাখত। কাবার্ডের একটা দেরাজে প্রায় লালচে রঙের একটা পরচুলা পেল, মাঝে-মধ্যে পরত স্বাতী। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করার পর ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলল অতিরিক্ত লম্বা গোছাগুলো, পরলে যাতে ওকে ঝাঁকড়া-চুলো পুরুষ বলে মনে হয়। দু'বার আয়নার সামনে দাঁড়াল, আরও খানিক কাট-ছাঁট করার পর মানিয়ে গেল মাথায়।

নিজের বেডরূমে ঢুকে স্যুট ছেড়ে পুরানো একখানা রঙচটা জিনস পরল, গায়ে চড়াল টি-শার্ট, তার ওপর কলার লাগানো নাইলন জ্যাকেট। সবশেষে উইগটা ঢাকল মাথায় তোবড়ানো একটা অস্ট্রেলিয়ান টেনিস হ্যাট চাপিয়ে। জুতো খুলে পায়ে গলাল একজোড়া হাইকিং বুট, ফিতে বাঁধা শেষ করে করিডর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল গ্যারেজে। এখানে একটা রাকস্যাক আছে, ভেতর থেকে ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট বের করে মেঝের একপাশে রেখে দিল। গ্যারেজের এক কোণের ছোট একটা ডাস্টবিন থেকে পুরানো কয়েকটা টাইমস পত্রিকা তুলে এনে ভরল, ফলে বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল রাকস্যাকের পেট। স্যাব-এর দরজা খুলে ভেতরে রাখল ওটা, সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠে এল ফ্ল্যাটে।

চেম্বারে বসে টেপ-রেকর্ডার অন করল রানা। গত দু'দিনে যা যা ঘটেছে সব বলল, ডোনার কিডন্যাপ হবার তথ্য জানাল, সবশেষে বলল এখন কি করতে যাচ্ছে। টেপ-রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে এনভেলাপে ভরল, তাকে ঠিকানা লিখল রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার, তারপর রেখে দিল জ্যাকেটের পকেটে।

এবার শুরু হতে যাচ্ছে ওর প্ল্যানের কঠিন অংশটা। ফ্ল্যাটটার ওপর নজর রাখছে একজন লোক, তাকে চিনতে হবে। অন্ধকার লিভিংরূমে ঢুকে জানালার পর্দা সামান্য একটু ফাঁক করে রাস্তার ওপর চোখ বুলাল।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে, তবে দু'দিকে যতদূর দেখা যায় কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার ওপারে রিজেন্ট পার্ক, ভেতরে আলো থাকলেও গাছপালার ছায়াগুলো খুব গাঢ়। বৃষ্টির রাতে লুকিয়ে থাকার জন্যে পার্কই সবচেয়ে ভাল জায়গা। কিন্তু গাড়ি তো একটা থাকতে বাধ্য, তা না হলে লোকটা ওকে অনুসরণ করবে কিভাবে? রাস্তার ওপারে, ডান প্যাশে, পার্কটাকে দু'ভাগ করেছে একটা রাস্তা, ফ্ল্যাটের জানালা থেকে সেই রাস্তার মুখটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে ও। মুখ থেকে খানিকটা পিছনে কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রানা যখন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করবে, অপেক্ষারত গাড়ির ড্রাইভার ঠিকই সেটাকে দেখতে পাবে।

ভাঙা জানালা গলে, তারপর পানির পাইপ বেয়ে ফ্ল্যাট থেকে পিছনের বাগানে নেমে এল রানা, সেখান থেকে পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এল সরু একটা গলিতে। পা চালিয়ে প্রায় সিকি মাইল হেঁটে এসে মেইন রোডে উঠল, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল রিজেন্ট পার্কে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে-মধ্যে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। রাস্তায় কোন গাড়ি বা লোকজন দেখেনি ও। পার্কের ভেতরও কেউ নেই। তবু খুব সাবধানে এগোচ্ছে রানা. ওর ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের

সাইডরোডে পৌঁছুতে চায়, পার্ককে যেটা দু'ভাগ করেছে।

সাইডরোডে বেরুতেই খুশি হয়ে উঠল মন। যা ভেবেছিল, তাই–রাস্তার মুখ থেকে খানিকটা পিছনে সত্যি একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভিভা কার। হন হন করে এগোল রানা, আচরণে কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই। সরাসরি ড্রাইভারের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, স্ট্রীটলাইটের আলোয় ভেতরটা অস্পষ্ট, ড্রাইভিং সীট ছাড়া বাকি সব সীট খালি। 'এই যে, ভাই, তুমি কি বলতে পারবে…'

ভেতরের লোকটা জানালার কাঁচ কয়েক ইঞ্চি নামাল। 'যাও মিয়া, ভাগো…' হঠাৎ থেমে রানার হাতের রিভলবারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

'দরজাটা খোলো,' বলল রানা। 'খুব সাবধানে।' রিভলবারে চোখ রেখে নির্দেশ পালন করল লোকটা। 'বাইরে বেরোও।'

শরীরের দু'পাশ থেকে হাত দুটো যথেষ্ট দূরে রেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, রাগে কটমট করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'পিছন ফেরো,' নির্দেশ দিল রানা।

লোকটা পিছন ফিরতেই তার ঘাড়ে খালি হাতটা দিয়ে চাপ দিল রানা। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, তবে মাথা আর কাঁধ গাড়ির ভেতর।

'দুঃখিত, সাড়ে ন'টার আগে ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার কথা ছিল না, কিন্তু কি করব, অস্থির হয়ে উঠেছিলাম…'

'কাকে কি বলছ, আমি তো তোমার কথা…'

'চোপ, ব্যাটা!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'একটাই প্রশ্ন করব, উত্তরটা পছন্দ না হলে আজ এখানেই তোমার আয়ু শেষ। রাসেল স্কয়্যারে ঠিক কি ঘটবে?'

লোকটার ঘাড় আর কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে উঠল। 'সত্যি বলছি.

কিছুই আমি বুঝতে পারছি না...'

লোকটার একটা হাত গাড়ির দরজা চেপে ধরে আছে, সেটার ওপর উল্টো করা রিভলবারের বাড়ি মারল রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। দ্বিতীয় হাতটায় আবার আঘাত করল রানা, এবার আরও জোরে। 'শেষবার জিজ্ঞেস করছি। রাসেল স্কয়্যারে কি ঘটবে?'

'বললামই তো, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না...'

রিভলবারের বাঁট দিয়ে লোকটার মাথার পাশে পরপর দু'বার বাড়ি মারল রানা, জ্ঞান হারিয়ে সীটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। হাতে এমনিতেই সময় কম, এখানে তা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। অচেতন শরীরটাকে ঠেলে প্যাসেঞ্জার সীটে সরিয়ে দিল ও, ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট দিল, গাড়ি নিয়ে চলে এল নিজের ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে, থামল গ্যারেজের পাশে। ভিভা থেকে নেমে গ্যারেজের দরজা খুলে স্যাবটা বের করল। ভিভাটাকে ঢোকাল গ্যারেজের ভেতর। লোকটাকে মেঝেতে নামিয়ে তার দিয়ে হাত-পা বাঁধল, সেই তার দিয়েই একটা লূপ তৈরি করে গাড়ির বাম্পারে পরিয়ে দিল। কাজটা শেষ হতে হাতঘড়ি দেখল। ন'টা পনেরো।

পকেট থেকে রুমাল বের করে লোকটার মুখে গুঁজে দিল রানা, গাড়ি মোছার নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে মুখটা বাঁধল। বাইরে বেরিয়ে এসে তালা লাগাল গ্যারেজে, স্যাবে চড়ে রওনা হলো তাড়াতাড়ি।

পার্ক স্ট্রীট হয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে চলে এল রানা। টোটেনহাম কোর্ট রোডে পৌঁছে গাড়ি থামাল এনভেলাপটা পোস্ট করার জন্যে, তারপর বাঁক ঘুরে বেডফোর্ড রোডে ঢুকল, মিনিট কয়েক গাড়ি চালিয়ে থামল এসে অন্ধকার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একপাশে, ছায়ার মধ্যে।

বৃষ্টি আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে, হ্যাটের কার্নিস থেকে জলপ্রপাতের মত পানি ঝরছে। তুমুল বর্ষণের আওয়াজে চারদিকের রাস্তা থেকে ভেসে আসা যানবাহনের শব্দ অনেকটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে, ভোঁতা শোনাচ্ছে কানে। সামনে তাকালে রাসেল স্কয়্যারের পশ্চিম প্রান্তটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে রানা, গ্রিলের একটা বেড়াও দেখতে পাচ্ছে, একপাশে বেশ কয়েকটা গাছ—সারি সারি অনেকগুলো ফ্ল্যাটবাড়ি আর অফিস বিল্ডিং থেকে রাসেল স্কয়্যারটাকে আলাদা করে রেখেছে। ওর ঘড়িতে এখন ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বহুকাল হলো সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, উত্তেজনাকর মুহূর্তে আজ হঠাৎ ধোঁয়া গেলার ইচ্ছে হলো। সঙ্গে নেই, থাকলেও হয়তো খেত না; স্টিয়ারিং হুইলে আঙুল নাচিয়ে ড্রাম বাজাতে শুরু করল। তলপেট টান টান হয়ে ছিল, সেখানে ঢিল পড়ল খানিকটা। হুইলে আঙুল নাচানো বন্ধ করল, পরমুহূর্তে ডান পায়ের পাতা গাড়ির মেঝেতে টোকা মারতে শুরু করল। সময় বয়ে চলেছে। এক পর্যায়ে ধৈর্য হারিয়ে রাকস্যাক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি ছেড়ে। রাকস্যাকের স্ট্র্যাপ আটকাল কাঁধে, জ্যাকেটের চেইন অর্ধেক খোলা রাখল, প্রয়োজনের সময় যাতে দ্রুত রিভলবারে হাত দিতে পারে, তারপর হন হন করে ব্লুমসবারি ধরে এগোল। বাম দিকে বাঁক ঘুরে গ্রেট রাসেল স্কয়্যারে পড়ল ও, মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে হেঁটে এসে আলোয় পা রাখল। রাস্তা পার হয়ে সাউথ্যাম্পটন রো-র আরেক পাশে চলে এল।

ঘড়িতে এখন ন'টা আটত্রিশ। এবিসি শপ-এর দোরগোড়ায় থেমে রাস্তার দু'দিকে চোখ বুলাল, পোশাক-পরিচ্ছদ আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচার জন্যে আশ্রয় খুঁজছে একজন ভবঘুরে। ধীর গতিতে চলে গেল একটা পুলিস কার, ভেতরে বসা একজন পুলিস সতর্ক দৃষ্টি বুলাল ওর ওপর। ন'টা চল্লিশে খানিক দূর এগিয়ে আবার সাউথ্যাম্পটন রো পেরুল, চলে

এল ওয়োবার্ন প্লেস সাইডে। রাস্তা পেরুবার সময় একটা ট্যাক্সিকে যেতে দেয়ার জন্যে সেন্টার আইল্যান্ডে থামতে হলো। বৃষ্টির প্রকোপ বেড়ে যেতে ছুটল রানা, জ্যাকেটের ভেতর পানি ঢুকে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ছুটতে ছুটতেই চৌরাস্তায় পৌছে গেল। গাছপালার ভেতর ছড়ানো-ছিটানো ল্যাম্পগুলো থেকে সামান্যই আলো আসছে, তবু বাগানের খোলা গেটের ভেতর এক লোককে দেখতে পেল রানা। ইতস্তত না করে প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ও ঢুকছে, একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল লোকটা। 'এক মিনিট।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কি ব্যাপার?'

কাছে চলে এল লোকটা, বৃষ্টির মধ্যে ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে রানার মুখ। 'কিছু জানতে চেয়ো না। বাগান থেকে বেরিয়ে যাও, ঘুমোবার জন্যে অন্য কোন জায়গা দেখো।'

'কেন? বাগানটা কি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি?' রানার গলায় জেদ।

'এখানে থাকলে তোমার বিপদ হবে...,' নিজের বিপদ দেখতে পেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল লোকটা, রানার হাতে রিভলবার বেরিয়ে এসেছে।

'কোন শব্দ নয়,' হিসহিস করে বলল রানা। ইঙ্গিতে ঝোপটা দেখাল। 'ঘোরো, ওদিকে চলো।'

দম দেয়া পুতুলের মত ঘুরল লোকটা, ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঝোপের আড়ালে এসে তার কানের পাশে রিভলবারের বাঁট দিয়ে মারল রানা। অচেতন শরীরটাকে টেনে ঝোপের ভেতর ঢোকাল, তবে সময়ের অভাবে ভাল করে তার হাত-পা বাঁধা হলো না। সার্চ করে একটা পিস্তল পাওয়া গেল, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে।

ভেজা উইগ, হ্যাট আর রাকস্যাক থাকায় ওদের দু'জনকে

অন্তত বোকা বানানো গেছে। হাতঘড়ি দেখল রানা। ন'টা পঁয়তাল্লিশ।

ডালপালা ছড়ানো সারি সারি গাছগুলো চৌরাস্তাটাকে ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। পার্কের শূন্য বেঞ্চগুলোর মাথায় ল্যাম্প জ্বললেও মুষলধারার বৃষ্টি পর্দার মত আড়াল তৈরি করেছে, ল্যাম্পের আলো রাস্তায় পৌঁছুতে পারছে না। বাগানটার আকার-আকৃতি স্মরণ করছে রানা। রাস্তার ওপারে চিলিস হোটেলে বছর দুই আগে দু'রাত ছিল ও। যত দূর মনে পড়ে, পেরিমিটারকে ঘিরে হাঁটার একটা পথ আছে, ওই বৃত্তাকার পথের চারটে শাখা চারটে প্রবেশপথের দিকে এগিয়েছে, পার্কের চার কোণে ওগুলো। গোটা পার্ক লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। বৃত্তের মাঝামাঝি জায়গায় পাকা একটা চত্বর। চত্বর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর আড়াল করা একটা নিচু বিল্ডিং আছে। ওদিকের প্রবেশপথ দিয়ে রাস্তায় বেরুলে ওয়োবার্ন প্লেস দেখা যাবে, বাম দিকে। তবে গাছপালার আড়াল থাকায় প্রবেশপথ থেকে বিল্ডিংটা দেখা যায় না।

বিল্ডিংটার চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল রানা। অ্যামবুশ পাতার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। একদৃষ্টে ওদিকটায় তাকিয়ে থাকল ও। মান্ধাতা আমলের বাঁকা একটা রডের মাথায় ছোট একটা ল্যাম্প জ্বলছে। বিল্ডিংটার কোণ ঘুরে ওই ল্যাম্পের সরাসরি নিচে এসে দাঁড়াল এক লোক। মাথা নিচু করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল–রেইন কোটের ভেতর হাত গলিয়ে রিভলবার বের করে একটা সাইলেন্সার লাগাল, তারপর গুলি করে গুড়িয়ে দিল বালবটা। গোটা এলাকা অন্ধকার হয়ে গেল। বড় করে শ্বাস টানল রানা, পালস রেট বেড়ে গেছে, অ্যাড্রেনলিন-এর উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল শিরায় শিরায়।

ঠিক দশটায় ওয়োবার্ন প্লেসের প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকল

দু'জন লোক। থেমে ইতস্তত করছে, চারদিকে সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। তারপর পথটা ধরে পার্কের মাঝখানে, পাকা চত্বরটার দিকে এগোতে শুরু করল। চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার, রানার দিকে পিছন ফিরে। একজন হাত তুলে স্ট্রীট-এর দিকটা দেখাল।

তৃতীয় একজন লোক, একটা মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে, ছায়ার ভেতর থেকে চৌরাস্তায় বেরিয়ে এল, প্রায় ছুটতে ছুটতে অপর লোক দু'জনের কাছে চলে আসছে। তিনজন এক হয়ে কয়েক মুহূর্ত নিজেদের মধ্যে আলাপ করল, তারপর একজন ফিরে গেল ওয়োবার্ন প্লেস প্রবেশপথে, বাকি দু'জন মেয়েটাকে মাঝখান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। রানা আবার নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল। মেয়েটা ডোনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাকা চত্বরে দাঁড়িয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে লোক দু'জন। পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখছে রানা। বিল্ডিঙের আড়ালে, ছায়ার ভেতর লুকিয়ে থাকা লোকটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি স্নায়ু উত্তেজিত, তীক্ষ্ণ চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে, কি করা যায় সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে রানা। মনটাগু প্লেস-এর কাছাকাছি গাড়িটা রেখে এসেছে ও, ডোনাকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিতে পারলে মনটাগু প্লেস এগজিট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ইতস্তত করছে, এই সময় ছায়ার ভেতর থেকে ওই প্রবেশপথে বেরিয়ে এল আরও একজন লোক। শালারা! নিঃশ্বাসের সঙ্গে গাল দিল রানা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওকে। যদি নতুনও হয়, সিন্ডিকেটে ওদের প্রফেশন্যাল লোকের অভাব নেই। ওকে খুন করার জন্যে অন্তত ছ'জন গানম্যানকে পাঠিয়েছে। কে জানে, আশপাশে আরও হয়তো আছে।

এখন প্ল্যান করারও সময় নেই। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল নিয়ে

ছুটল রানা, বিল্ডিংটার পিছনে পৌঁছুতে চায়। কাদাপানির ওপর দিয়ে ছোটার সময় শব্দ হচ্ছে, তবে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে তা কারও শুনতে পাবার কথা নয়। বিল্ডিঙের পিছনে কেউ নেই। দেয়ালে পিঠ ঘষে একদিকের কোণ লক্ষ্য করে এগোল রানা, হাতে রিভলবার। কোণে থেমে সাবধানে উঁকি দিল। কোণটা ঘুরে তিন হাত এগোলেই লোকটাকে ছুঁতে পারবে ও, দাঁড়িয়ে আছে ছাদের প্রসারিত অংশের নিচে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। আরও সামনে, ওভারহেড ল্যাম্পের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, পাকা চত্বরের কাছাকাছি, ডোনাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোক দু'জন। হাত তুলে কি যেন বলতে চেষ্টা করল ডোনা। ডান পাশে দাঁড়ানো লোকটা দু'হাতে কাঁধ খামছে ধরে খুব জোরে বার কয়েক ঝাঁকাল তাকে।

কোণ ঘুরে লাফ দিল রানা, হাতে উল্টো করে ধরা রিভলবার। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ানো লোকটার খুলির পিছনে বাড়িটা পড়ার কথা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঝট করে ঘাড় ফেরাতে রিভলবারের বাঁটটা আঘাত করল সরাসরি মাঝ কপালে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রানা, কাদার ওপর ঢলে পড়ল লোকটা, হাত থেকে খসে পড়া পিস্তল, সরু পাকা পথে পড়ে ছিটকে দূরে সরে গেল।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা, লাফ দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে একটা হাঁটু গাড়ল, লম্বা করা দু'হাতে রিভলবার। দূরত্ব চল্লিশ গজের কিছু কম, লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলে কি ঘটবে পরোয়া করছে না, গুলি করল ডোনার ডান পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে। গুলি লেগেছে, বুঝতে পেরেই চিৎকার করে ডাক দিল ও। শুনতে পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল ডোনা, তবে রানার উল্টোদিকে। পরপর আরও দুটো গুলি করল রানা। দ্বিতীয় লোকটা ইতিমধ্যে ডাইভ দিয়েছে ঝোপ লক্ষ্য করে। সে শূন্যে দাটার

একটা লাগল গলায়, অপরটা পাঁজরে।

'ডোনা!' আবার চিৎকার করল রানা, এবার আরও জোরে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডোনা, চিৎকারটা কোন দিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল, তারপর ঘুরে ছুটতে শুরু করল। নাগালের মধ্যে আসতেই তাকে ধরে একটা ঝোপের দিকে ঠেলে দিল রানা। পরমুহূর্তে দেখতে পেল ওয়োবার্ন প্লেস এগজিট-এ লুকিয়ে থাকা গার্ড সরু পথ ধরে ছুটে পার্কের ভেতরে ঢুকছে। ঝোপ লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, বাতাসে শিস কেটে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

আতঙ্ক আর ক্লান্তিতে ফোঁপাচ্ছে ডোনা, কিন্তু রানা থামল না, তার হাত ধরে বিল্ডিংটার পিছনে চলে এল, ফেলে আসা পথ ধরে আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টি আর ঝোপ-ঝাড় সাহায্য করছে ওকে। চিলিস হোটেলের উল্টোদিকে থামল ও। সামনে গ্রিল, তারপর ফুটপাথ আর রাস্তা, রাস্তার ওপারে হোটেলটা। রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি ছুটে গেল। চিলিস হোটেলের সামনে ছাতা মাথায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলছে আর চারদিকে চোখ বুলিয়ে তুমুল বর্ষণের বিচিত্র রূপ উপভোগ করছে। একজন পথিককেও দেখা গেল, সাউথ্যাম্পটন রোড ধরে এগিয়ে আসছে।

গ্রিলটা অনেক উঁচু, ডোনাকে নিয়ে টপকাতে হলে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। তার হাত ধরে আবার ছুটল রানা, সর্বক্ষণ ঝোপের আড়ালে থাকছে। পাঁচ মিনিট আগে যে লোকটার মাথায় বাড়ি মেরেছিল, এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি, হোঁচট খেয়ে তাকে টপকে এল। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রবেশপথের দিকে এগোচ্ছে, দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

'ছোটো!' ক্লান্ত ডোনাকে ধমক দিল রানা, সরু পাকা পথ ধরে পার্কের বাইরে, ফুটপাথে বেরিয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে ওয়োবার্ন

প্লেস সাইডে চলে আসছে ওরা, একটা ট্যাক্সি দেখে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। শেষ মুহূর্তে ড্রাইভার দ্রুত হুইল না ঘোরালে দু'জনেই ওরা চাপা পড়ত। পিছন থেকে একটা গুলি হলো, হোটেলের সামনে ল্যাম্পপোস্টে লেগে টং করে আওয়াজ তুলল বুলেটটা। ফুটপাথ ধরে ছুটে এসে কয়েকটা ধাপ টপকে হোটেলের প্রবেশপথে থামল রানা, ডোনার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। গ্রিলের মাথা থেকে লাফ দিয়ে পার্কের বাইরে নামল এক লোক, রাস্তা না পেরিয়েই হোটেলের দিকে ছুটে আসছে। দরজা খুলে হোটেলের ভেতরে ঠেলে দিল রানা ডোনাকে, কি ঘটছে দেখার জন্যে হেড পোর্টার ছুটে বেরিয়ে আসতেই ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দিল। ধরাশায়ী পোর্টারের সঙ্গে আরও দু'জন পোর্টার যোগ দিল, তাদেরকে টপকে বার-এ ঢুকল রানা, পিছনের দরজা দিয়ে ডোনাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওয়োবার্ন প্লেসের সামনে।

'আমার ঠিক পিছনে থাকো।' হাঁপাচ্ছে রানা, কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল বার্নার্ড স্ট্রীটে। রাস্তার প্রায় শেষ মাথায়, নির্জন নিউজ স্ট্যান্ডের পাশে, 'আন্ডারগ্রাউন্ড' লেখা একটা নিওন সাইন দেখা যাচ্ছে, লেখাটার নিচে একটা তীরচিহ্ন টিউব স্টেশনের প্রবেশ পথ নির্দেশ করছে।

দৌড় দিল ওরা, সাইনটাকে পেরিয়ে ঢুকে পড়ল লিফটে। চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে শিখ অপারেটর, ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠল।

'জলদি!' লোকটাকে আরেকবার ঝাঁকাল রানা। 'ট্রেন মিস করলে বিপদে পড়ে যাব!'

রানার হাতে রিভলবার দেখে লোকটা পাথর হয়ে গেছে। পকেট থেকে এক পাউন্ডের একটা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল রানা। 'জলদি!' টান দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। চোখ

বুজে বিড়বিড় করছে শিখ অপারেটর, দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপল। পুরানো লিফট ঝাঁকি খেতে খেতে নিচে নামছে।

লিফটের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে ডোনা, চোখ দুটোয় কাচের মত চকচকে ভাব। অপারেটর চোখ খুলছে না। লিফটটা যেন অনন্তকাল ধরে নামছে। একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। অপারেটর লাফ দিয়ে সরে এসে দরজা খুলে দিল। ডোনার হাত ধরে লিফট থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, সেটা ক্রমশ উঁচু হয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে উঠে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। উত্তরমুখী রেললাইন খালি। ঘাড় ফিরিয়ে দক্ষিণমুখী লাইনের দিকে তাকাল, ওদিকে বাতাসের ক্ষীণ নড়াচড়া লক্ষ করল। 'তুমি আহত হওনি তো?' ডোনাকে জিজ্ঞেস করল রানা। সব ঠিক আছে?'

এখনও হাঁপাচ্ছে ডোনা, রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, পরমুহূর্তে এদিক ওদিক নাড়ল সেটা–দিশেহারা বোধ করছে, তবে মুখের রঙ ফিরে এসেছে, চোখ দুটোও এখন আর চকচক করছে না। 'আমি ভাল আছি, মাসুদ ভাই...শুধু হাঁপিয়ে গেছি।'

'শোনো, ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। ব্রিজ পেরিয়ে ওদিকের প্ল্যাটফর্মে যাবার সময় নেই। রেললাইন টপকে ওপারে পৌঁছুতে হবে। ঠিক আছে?'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ডোনা, তাকে দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলে প্ল্যাটফর্মের কিনারায় চলে এল রানা। লাফ দিয়ে ট্র্যাকস-এর মাঝখানে নামল ও, হাত বাড়িয়ে নামতে সাহায্য করল ডোনাকে। দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম আর ওদের মাঝখানে মাত্র চার ফুট দূরত্ব, মাঝখানে হাই ভোল্টেজ থার্ড রেইল। রেললাইন ধরে খানিকটা ছুটে এল রানা, থামল কংক্রিটের একটা উঁচু সার্ভিস স্টেপ-এর সামনে। 'ধাপটায় ওঠো,' বলল ও। 'রেইল না ছুঁয়ে একটা পা রাখো ওদিকের প্ল্যাটফর্মে।'

টানেল ধরে ছুটে আসা বাতাসের গর্জন জানিয়ে দিল একটা ট্রেন আসছে। ধাপটার ওপর উঠে একটা পা বাড়াল ডোনা, হাই ভোল্টেজ রেইলকে স্পর্শ না করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকছে। এক সময় প্লাটফর্মে ঠেকল ওর হাঁটু। ইলেকট্রিফায়েড রেইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, ডোনার নিতম্বে হাত ঠেকিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারল। প্লাটফর্মের ওপর ছিটকে পড়ল ডোনা, হাত-পা ছড়িয়ে সেখানেই পড়ে থাকল, আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে।

ঘাড় বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার তাকাল রানা, ট্রেনের হেডলাইট টানেলের বাঁকটাকে আলোকিত করে তুলছে। উল্টোদিকের প্লাটফর্মে এইমাত্র ঢুকেছে এক লোক, সঙ্গে একটা মেয়ে; ধাপ থেকে রানা লাফ দিয়ে ইলেকট্রিফায়েড রেইল টপকাতে যাচ্ছে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ধাপের কিনারায় এক সেকেন্ড টলমল করল শরীরটা, তারপর এক লাফে প্ল্যাটফর্মে চলে এল রানা। ডোনাকে দাঁড় করিয়ে ছুটল ও, ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে থেমে গেছে ট্রেন। প্রথম কমপার্টমেন্টে উঠল ওরা, পরেরটায় লোকটা উঠল তার সঙ্গিনীকে নিয়ে। মেয়েটা রেগে গেছে, বোঝা গেল রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকতে দেখে। ডোনার পাশের সীটে বসল রানা, বড় করে শ্বাস নিল, তারপর লাফ দিয়ে উল্টোদিকের একটা সীটে পড়ল, সীটের ওপর হাঁটু গেড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। ইমার্জেন্সী সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসছে দু'জন লোক, হাতে পিস্তল। প্ল্যাটফর্মে নামতে পারল, কিন্তু হুস্‌স্‌ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল প্রতিটি কমপার্টমেন্টের দরজা, ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করল। জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল রানা। দু'জনের একজন পিস্তল তুলে গুলি করতে গেল, তবে করল না। দু'জনেই ঘুরে আবার সিঁড়ির দিকে এগোল। ইতিমধ্যে টানেলে ঢুকে পড়েছে ট্রেন।

ফিরে এসে আবার ডোনার পাশে বসল রানা। দু'হাতে মুখ

ঢেকে রেখেছে ডোনা, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা ও অভয় দিতে যাবে রানা, ওকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা, তারই ফাঁকে উল্টোদিকের জানালার ওপর সাঁটা পিকাডেলি লাইনের চার্টটা খুঁটিয়ে দেখে নিল। পরবর্তী স্টেশন হলবর্ন। লোক দু'জন ট্রেনের আগে ওখানে পৌঁছুতে পারবে না। ওরা যদি গাড়ি নিয়ে রওনা হয়, শহরটাকে আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে নাইটসব্রিজ-এ পৌঁছুতে হবে, তবেই যদি ট্রেনের আগে সামনের কোন স্টেশনে পৌঁছুতে পারে। এক পর্যায়ে টানেল থেকে স্ট্রীট লেভেলে উঠবে ট্রেন, লোক দু'জন হাল না ছাড়লে তাদের গাড়ি জানালা থেকে দেখতে পাবে রানা, কারণ লাইনটা বেশ অনেক দূর রাস্তার পাশ দিয়ে গেছে।

ডোনা এক সময় শান্ত হলো, রানাকে ছেড়ে নড়েচড়ে বসে হাত দিয়ে মুখ মুছল। জ্যাকেটের পকেট থেকে রুমাল বের করে তার হাতে গুঁজে দিল রানা। মুখ থেকে চুল সরিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল ডোনা, জানালার কাঁচে নিজের চেহারা দেখল, তারপর কোটের পকেটে হাত ভরল চিরুনির খোঁজে।

হাসি চেপে পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে রিলোড করল রানা। সতর্ক দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডোনা, চিরুনি ধরা হাতটা স্থির হয়ে গেছে।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' তাকে আশ্বস্ত করল রানা, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি। কিন্তু হাসিটা ম্লান হয়ে গেল জানালার পাশ দিয়ে হলবর্ন লেখা সাইনটাকে পিছিয়ে যেতে দেখে। ট্রেনের গতি গাড়ির চেয়ে বেশি, জানা সত্ত্বেও হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। ট্রেন টানেল থেকে বেরুতেই ডোনাকে টেনে সীট ছেড়ে নিচে বসাল। প্ল্যাটফর্মের প্রায় শেষ মাথায় থামল ট্রেন। দরজা খুলে গেল, সেটার একপাশে উবু হয়ে বসে বাইরে উঁকি দিল।

বয়স্ক এক দম্পতি উঠল একটা কমপার্টমেন্টে। প্ল্যাটফর্মে আর কেউ নেই। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আবার সচল হলো ট্রেন। ডোনাকে সীটে বসার ইঙ্গিত করল রানা, নিজেও টলতে টলতে এগিয়ে এসে তার পাশে বসল।

'মাসুদ ভাই, আপনি না এলে ওরা আমাকে...'

'জানি,' থামিয়ে দিল রানা। 'এখন নয়, পরে সব শুনব।'

'আপনি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছেন,' ফিসফিস করে বলল ডোনা। 'আমাদের এজেন্সির এজেন্টরা মাসুদ ভাই বলতে অজ্ঞান, কারণটা আজই প্রথম উপলব্ধি করলাম।' রানা নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখতে চুপ করে গেল ডোনা। শ্রদ্ধায় নিচু হয়ে এল মাথা, ফলে কপালটা ঠেকল রানার কাঁধে।

কোভেন্ট গার্ডেনে থামল ট্রেন। সঙ্গিনীকে নিয়ে নেমে গেল লোকটা। কিছুই ঘটল না, আবার ছুটল ট্রেন। পরবর্তী স্টেশন লেস্টার-স্কয়্যার। ট্রেন থামতেই নেমে পড়ল ওরা।

'লোকগুলো কি...,' শুরু করল ডোনা, কিন্তু তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে রানা ছুটতে শুরু করায় প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় এসে গেট দিয়ে বাইরে বেরুল, থামল এসক্যালেইটার-এর গোড়ায়। 'না, ডোনা,' এতক্ষণে ডোনার অসমাপ্ত প্রশ্নের জবাব দিল রানা, 'অন্তত এখনও আমাদের কাছাকাছি আসতে পারেনি ওরা। কিন্তু পিকাডিলী লাইনে থাকলে ধরে ফেলতে পারে।'

এসক্যালেইটারের মাথায় ওঠার পর অপ্রত্যাশিত একটা সমস্যায় পড়তে হলো। মহিলা কুস্তিগির বলে চালিয়ে দেয়া যায়, পরনে ইউনিফর্ম, ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই, হাত পাতল ওদের সামনে। দ্রুত ব্যাখ্যা করল রানা, ব্যস্ততার দরুন টিকেট কাটতে ভুলে গেছে। কোমরে হাত দিয়ে ভুরু কোঁচকাল মহিলা।

দেরি হওয়ায় ভয় পাচ্ছে ডোনা, এসক্যালেইটারের নিচে চোখ বুলিয়ে দেখছে কেউ এদিকে আসছে কিনা। পকেট থেকে এক পাউন্ডের একটা নোট বের করে রানা বলল, 'ইচ্ছে হলে ফাইন সহ দুটো টিকেটের দাম রাখুন, তবু দয়া করে দেরি করিয়ে দেবেন না, প্লীজ।'

'আমার কাছে ভাঙতি নেই,' বলে রানার হাত থেকে নোটটা এক রকম ছিনিয়ে নিল মহিলা। তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল রানা, একটু ইতস্তত করে ডোনাও ওর পিছু নিল।

নিচে নেমে টিকেট কাউন্টারে চলে এল ওরা। 'নর্দার্ন লাইনের দুটো টিকেট দিন, প্লীজ,' কাউন্টারে বসা লোকটাকে বলল রানা।

'কেন? আবার কেন ট্রেনে চড়ব?' জানতে চাইল ডোনা।

'ওদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ছিলে, বুঝতে পারোনি কত বড় সিন্ডিকেট চালায়? প্রতিটি স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্যে পাহারা বসিয়েছে ওরা। ফাঁকি দেয়ার একটাই উপায়, বারবার লাইন বদলে ওদেরকে ধাঁধায় ফেলে দেয়া। সুযোগ মত একটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিতে হবে।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা তাই করল ওরা, নর্দার্ন লাইনের ট্রেন ধরে ওয়ারেন স্ট্রীট স্টেশনে নামল, তারপর ভিক্টোরিয়া লাইন ধরে উল্টোদিকে রওনা হলো, নামল ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। ইতিমধ্যে উইগ আর হ্যাট মাথা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে রানা। একই স্টেশন, অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ায় দ্বিতীয় বার ফিরে এল ওরা, ঘড়িতে ইতিমধ্যে সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। স্টেশনে প্যাসেঞ্জার ও পোর্টারের সংখ্যা খুব একটা কম নয়, ভিড়ের মধ্যে ডোনার হাত ধরে হাঁটছে রানা, অপর হাতে ধরে আছে পকেটের রিভলবার। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতেই আবার বৃষ্টির মধ্যে পড়ল। সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

হাত নেড়ে সেটাকে বিদায় করে দিল রানা, ডোনাকে নিয়ে

ফুটপাথ ধরে হন হন করে হাঁটছে।

'আপনি না বললেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিতে হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সাবধানের মার নেই। রাস্তার বাঁকে আরেকটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে।'

লাইনের সর্বশেষ ট্যাক্সিটায় চড়ল ওরা, অন্যান্য ট্যাক্সির ড্রাইভারদের প্রতিবাদ কানে তুলল না। ড্রাইভার জানতে চাইল, 'কোথায় যেতে হবে, স্যার?'

'বলছি। আগে তুমি গাড়ি ছাড়ো।' এক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'প্রথমে হ্যারোড-এ চলো।'

'কিন্তু স্যার, হ্যারোড তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'বন্ধ হলেও, শো-কেসগুলোয় সারারাত আলো জ্বলে,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গিনীর শখ হয়েছে, ডায়ানা আর আল ফায়েদের যুগল ফটো দেখবে।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। গলা খাদে নামিয়ে ডোনাকে রানা বলল, 'আমার ফ্ল্যাটে ফেরা সম্ভব নয়, ওখানে অবশ্যই অপেক্ষা করছে ওরা। রানা এজেন্সির অফিসেও যাওয়া উচিত হবে না, কারণ ওখানে মাত্র দু'জন গার্ড আছে।'

'বুঝতে পারছি,' ফিসফিস করল ডোনা। 'আমাদের কোন সেফ-হাউসে উঠতে হবে।' খানিকটা উত্তেজিত ও খুশি মনে হলো তাকে। 'নতুন অভিজ্ঞতা, আগে কখনও উঠিনি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সেফ-হাউসে উঠতে হয় লম্বা একটা সময় লুকিয়ে থাকার প্রয়োজনে। আমাদেরকে ফিল্ডে থাকতে হবে, ডোনা। আমরা পাল্টা আঘাত করতে যাচ্ছি।'

মুখ শুকিয়ে গেল ডোনার। 'মাসুদ ভাই, আমার সাংঘাতিক ভয় করছে। এ আমরা কিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম?'

'তোমার কোন চিন্তা নেই,' অভয় দিয়ে বলল রানা। 'তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল আমাকে ফাঁদে ফেলার টোপ

হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। আবার ওরা সে চেষ্টা করতে পারে–তোমাকে বা অন্য কাউকে। আমার প্রথম কাজ তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ওদের সঙ্গে ক'জন ছিল, সব মিলিয়ে?'

'নয় কি দশজন,' বলল ডোনা, 'তবে টেলিফোনে বহু লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি।'

'নামগুলো মনে রেখেছ?'

'বব, নিক, চার্লি, হিলি…কিন্তু আমার সন্দেহ, এগুলো ছদ্মনাম, মাসুদ ভাই,' শেষ দিকে জড়িয়ে এল ডোনার গলা, ঘুমিয়ে পড়ছে সে। খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, প্রবল আতঙ্ক আর উত্তেজনার পর স্নায়ু অবশ হয়ে আসছে।

'তোমাকে ওরা কোত্থেকে কিডন্যাপ করে?' জানতে চাইল রানা।

'জানি না…ধ্যেত, কি বলছি–অফিস থেকে ফেরার পথে, পার্ক স্ট্রীটে…' কথা শেষ হলো না, রানার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ডোনা।

হ্যারোড-এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ড্রাইভারকে রানা বলল, 'আমার সঙ্গিনী ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে চলো আমাদের।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে একবার দেখে নিল ড্রাইভার, তারপর বলল, 'ইয়েস, স্যার!'

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্মকর্তারা রানা এজেন্সির ডিরেক্টর হিসেবে রানাকে সমীহ করেন, এখানে ওর অনেক বন্ধু-বান্ধবও আছে, কিন্তু আজ রাতে যারা ডিউটি দিচ্ছে তাদের মধ্যে ওর ঘনিষ্ঠ তেমন কাউকে দেখা গেল না। ডিউটি অফিসারকে নিজের পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো, ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসার কারণটাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হলো। অফিসার ওদেরকে

ওয়েটিং-রুমে বসিয়ে রেখে নিজের ডেস্কে ফিরে গেল, রানা কয়েকজন কর্মকর্তার নাম বলেছে, ফোনে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবে।

সোফায় বসেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল ডোনা। একটু পর ডাক পড়ল রানার, চীফ কনস্টেবল জন হার্পার ফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে চান। সদ্য ঘুম ভাঙানো হয়েছে তাঁর, তবে সেজন্যে তিনি মোটেও বিরক্ত হননি। ডিউটি অফিসারের মুখ থেকে ঘটনার বর্ণনা শুনেছেন তিনি, তবু রানার মুখ থেকে আরেকবার শুনতে চাইলেন। শোনার পর বললেন, 'ডিউটি অফিসারকে যা বলার বলে দিচ্ছি, উপস্থিত অফিসাররা সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করবে। আমিও আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে রানার অনুরোধে রাসেল স্কয়্যারে ছুটল একদল অফিসার, পার্কে ও রাস্তায় কোথায় কি ঘটেছে সব তাদেরকে বলা হয়েছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে নিজে রানা বেরুল না, তবে ফোন করে এজেন্সির লন্ডন শাখার প্রধান ফরহাদের ঘুম ভাঙাল। রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে শুনে কাপড়চোপড় পরে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় বেরুতে এজেন্সির কোন এজেন্টেরই দশ মিনিটের বেশি লাগল না। এখন থেকে প্রতিটি কাজ রুটিন অনুসারে চলবে, সবাই জানে কার কি করণীয়। এজেন্টদের একটা গ্রুপ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে, ইনফর্মার আর গ্যাং লীডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, উপকার পাওনা থাকলে বিনিময়ে গোপনে কোথায় কি ঘটছে তার তথ্য জানতে চাইবে, কিংবা ভবিষ্যতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেবে। এজেন্সির সেফ-হাউসগুলো যারা পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে। সবার ছুটি বাতিল হয়ে গেছে। রাস্তায় কেউ বেরুলে সে জানবে এজেন্সির আরেকজন লোক কাছ থেকে তাকে কাভার দিচ্ছে।

স্বাতীরও ঘুম ভাঙাল রানা, ফোন নম্বরটা একজন এজেন্টের কাছ থেকে জেনে নিয়ে। কোন ভূমিকা না করে শুধু বলল, 'রেড অ্যালার্ট। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলে এসো।' তারপর ফোন করল আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার উলরিখ বাউচারকে।

চীফ কনস্টেবল জন হার্পার ঠিক আধ ঘণ্টা পরই পৌঁছুলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলোর সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেছে রানা–কোন সাহায্য চায়নি, একজন শুভানুধ্যায়ীকে কি ঘটেছে আর কি ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে অবহিত করেছে মাত্র।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা অকুস্থল থেকে টেলিফোনে জন হার্পারকে রিপোর্ট করল–পার্কে ও রাস্তায় রক্তের দাগ পাওয়া যায়নি, বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে। কোন লাশ বা আহত ব্যক্তিকেও পাওয়া যায়নি। হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোয় খবর নেয়া হয়েছে, গুলিবিদ্ধ কেউ ভর্তি হয়নি। একটু পর আরেকটা খবর এল। রানার গ্যারেজ থেকে লোকটা পালিয়েছে। গ্যারেজের তালা ভাঙা হয়নি, খোলা হয়েছে বাইরে থেকে–অর্থাৎ সিন্ডিকেটের লোকেরা তাকে বের করে নিয়ে গেছে।

জন হার্পার রানাকে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে ফেলল, খুবই ওয়েল অর্গানাইজড সিন্ডিকেট বলতে হবে।'

'সাহায্য করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. হার্পার,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা।

স্বাতীকে নিয়ে এল রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্ট। তারা রিপোর্ট করল–অফিস, এজেন্টদের ফ্ল্যাট আর প্রতিটি সেফ-হাউসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

উলরিখ বাউচার পৌঁছুলেন রাত সাড়ে তিনটের দিকে। ডোনা

তখনও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। স্বাতীকে তার কাছে রেখে চীফ কন্সটেবলের অফিস কামরায় মীটিঙে বসল রানা।

চার

বিকেল ঠিক চারটেয় অ্যালার্ম বেজে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে থাকল রানা, তারপর হাত বাড়িয়ে বন্ধ করল আওয়াজটা। চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে, আরও কয়েক মুহূর্ত পর মনে পড়ল কেন অ্যালার্ম সেট করে রেখেছিল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল ও, কাপড়চোপড় খুলে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। আধ ঘণ্টা পর দাড়ি কামিয়ে, নতুন কাপড়চোপড় পরে বেরিয়ে এল, শার্টের ওপর ভারী একটা সোয়েটার চাপিয়েছে।

চেম্বারে এসে ইন্টারকমে স্বাতীর সঙ্গে কথা বলল ও। 'ডোনাকে নিয়ে চেম্বারে এসো। তৈরি হয়েই এসো, আমরা বেরুব।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' ঘুম জড়ানো গলায় বলল স্বাতী।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আজ সকালে ওদেরকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছে রানা, তিনজনের কেউই এজেন্সির অফিসে যায়নি। স্বাতী আর ডোনা ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ খাবার সময়টুকু ছাড়া এতক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছে। রানা শুয়েছিল দুটোর পর, তার আগে পর্যন্ত চেম্বারে বসে কাজ করেছে। কাজ মানে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, আইএনসিসি, রানা এজেন্সি আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস থেকে আসা রিপোর্ট রিসিভ করেছে; তারপর যাকে যা

প্রয়োজন–কাউকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কাউকে দিয়েছে জরুরী নির্দেশ।

স্বাতী আর ডোনা তৈরি হয়ে আসতে পনেরো মিনিট সময় নিল। ডোনার হাতে ধূমায়িত কফির কাপ সহ ট্রে দেখে হাসল রানা, বলল, 'ধন্যবাদ। বসো তোমরা।'

ডোনাকে তাজা ও হাসিখুশি লাগছে। খালি একটা চেয়ার টেনে রানার মুখোমুখি বসল সে। স্বাতী এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বসল, তবে ডোনার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে, দু'জনের মাঝখানে একটা চেয়ার খালি থাকল।

পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল রানা। ক্রাইম সিন্ডিকেট এখন ধরে নেবে রানা এজেন্সির এজেন্টরা এবার তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাজেই নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্যে ও বেআইনী ড্রাগ ব্যবসা রক্ষা করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে তারা। ওর সবচেয়ে বেশি ভয় স্বাতী আর ডোনাকে নিয়ে। সিন্ডিকেট সুযোগ পেলে ওদের ওপরই প্রথম আঘাত হানবে। 'তাই,' সবশেষে বলল রানা, 'তোমাদেরকে আমি নিরাপদ একটা জায়গায় রেখে আসতে যাচ্ছি।'

'কোন সেফ হাউসে?' জানতে চাইল স্বাতী।

'না, ইংল্যান্ডের কোন সেফ-হাউসকেও এখন আর আমি পুরোপুরি নিরাপদ বলে মনে করছি না,' বলল রানা। 'কারণ নতুন এই সিন্ডিকেটের নেটওঅর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। তোমাদেরকে আমি এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে কোনভাবেই সিন্ডিকেট তোমাদের নাগাল পাবে না।'

প্রতিবাদ করল স্বাতী, বেশ জেদের সুরেই, 'কিন্তু মাসুদ ভাই, আমি আর ডোনা, দু'জনেই আমরা ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট। এজেন্সির আর সবাই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়বে, আর আমরা কিডন্যাপ হবার ভয়ে লুকিয়ে থাকব?'

ডোনা তাকে সমর্থন করল, 'আমারও সেই কথা, মাসুদ ভাই। আমার তো আরও লুকিয়ে থাকা চলে না। ঋজুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আপনি জানেন। তাকে ওরা খুন করেছে। তারপর আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। আপনিই বলুন, আমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করবে না?'

হেসে ফেলল রানা, বলল, 'আমি কি বলেছি তোমাদেরকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? আমাদের একজন খুন হয়ে গেছে, অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেব। তোমরাও লড়বে, তবে নিরাপদ একটা ঘাঁটি থেকে।'

'কখন আমরা রওনা হচ্ছি?' খুশি হয়ে উঠল ডোনা। 'যাচ্ছি কোথায়?'

'রওনা হচ্ছি সন্ধের পরপরই,' বলল রানা। 'তোমাদেরকে আমার বিশ্বস্ত এক বন্ধুর কাছে রেখে আসব।'

'কোথায়?' জানতে চাইল স্বাতী।

'অ্যালডারশট-এ।'

'অ্যালডারশট?' ডোনা আর স্বাতী দু'জনেই একযোগে জিজ্ঞেস করল, অবাক হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় আর্মি বেস। ওটার চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর হতে পারে?'

'কিন্তু ওখানে কেন? ওখান থেকে আমরা কিভাবে কাজ করব?' চেয়ারের কিনারায় সরে এল স্বাতী। চেহারাই বলে দেয়, রানার প্রস্তাব তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না।

রানা কিছু বলার আগে ডোনা বলল, 'তারচেয়ে, মাসুদ ভাই, আমি যেমন আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে কাজ করছিলাম...'

থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'ঋজু খুন হবার পর আইএনসিসি-র সঙ্গে রানা এজেন্সির অফিশিয়াল বা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে মীটিঙে বসেছিলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট

কমিশনার বাউচারকে কথাটা আমি জানিয়ে দিয়েছি। প্রয়োজনে ওদের সাহায্য আমরা নেব, তবে আনঅফিশিয়ালি।'

স্বাতী বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না লন্ডনে কেন আমরা থাকতে পারব না। রানা এজেন্সির নেটওঅর্ক যথেষ্ট শক্তিশালী, রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করার পর আমার বা ডোনার ওপর হামলা হবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

রানাকে হঠাৎ কঠিন দেখাল। 'এটা তর্ক করার সময় নয়, স্বাতী। রেড অ্যালার্ট-এর অন্যতম শর্তের কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি, যে-কোন নির্দেশ বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে।' ডোনার দিকে তাকাল ও। 'অ্যালডারশটে বেশ কয়েকদিন থাকতে হতে পারে তোমাদের। যদি প্রয়োজন মনে করো দেশের বাড়িতে টেলিফোন করে তোমার মা-বাবাকে জানাও তাঁরা যেন দুশ্চিন্তা না করেন। তবে কোথায় যাচ্ছ বলবে না।' আবার স্বাতীর দিকে তাকাল। 'তুমিও তোমার ভাইকে ফোন করতে পারো। সাবধান, কোন তথ্য দেবে না।' হাতঘড়ি দেখল। 'আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা।'

স্বাতী হাত বাড়াল একটা ফোনের দিকে, চেহারা থমথম করছে।

রানা বাধা দিল। 'ফোন লাইন জোড়া লাগানো হয়েছে, তবে এখান থেকে ফোন করা এখনও নিরাপদ নয়। রওনা হবার পর রাস্তার কোন ফোনবুদ থেকে কোরো।'

ক্যাম্পিং গিয়ার রি-প্যাক করে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল রানা। ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অ্যালডারশট দেড় ঘণ্টার পথ, রওনা হবার পর ফোন করার কথাটা স্বাতী মনে করিয়ে দিল একবার। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পৌঁছে উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে অক্সফোর্ড সার্কাস হয়ে রিজেন্ট স্ট্রীটে ফিরে এল স্যাব, কেউ

ওদেরকে অনুসরণ করছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে রানা। পিছনে একটা গাড়ি আছে, আরোহীরা রানা এজেন্সির লোকজন। ওয়েলিংটন রোডে পৌঁছে উত্তর দিকে ছুটল স্যাব, রাস্তার পাশে ফোনবুদ থাকলেও রানা থামল না।

এক সময় পিছনের গাড়িটাকে সঙ্কেত দিল রানা, পিছিয়ে পড়ল সেটা, তারপর এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়ি এম-ফোরে উঠে এল, যানবাহনের মিছিলের সঙ্গে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পর গ্রেট ওয়েস্ট রোড লিঙ্ক হয়ে এম-থ্রীতে চলে এল। সামনে একটা ফোনবুদ দেখে থামল রানা। স্বাতী আর ডোনা পিছনের সীটে বসেছে, গাড়ি থামতেই প্রথমে নেমে গেল স্বাতী। সে ফোন করে ফিরে আসতে ডোনা গেল।

আবার রওনা হবার পরও কেউ তেমন কথা বলছে না। অ্যালডারশট শহরে ঢুকে উত্তর দিকে বাঁক নিল রানা, সারি সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে আর্মি বেস-এর মেইন গেটে পৌঁছে গেল।

বক্স থেকে একজন সেন্ট্রি বেরিয়ে এল। হেডলাইটের আলো কমিয়ে গাড়ি থামাল রানা।

'ইয়েস, স্যার?'

প্রথমে নিজের, তারপর স্বাতী ও ডোনার পরিচয় দিল রানা, বলল, 'কর্নেল জন রিচমন্ড-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' সবাই ওরা নিজেদের পরিচয়-পত্র জানালা দিয়ে বের করে দিল।

ওগুলো নিয়ে গাড়ির ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখল মিলিটারি পুলিস। 'এক মিনিট, স্যার,' বলে পিছিয়ে ঢুকে পড়ল সেন্ট্রি বক্সে, ফোনের রিসিভার তুলে কথা বলছে কারও সঙ্গে।

'আমাদেরকে এখানে রেখে আপনি কি লন্ডনে ফিরে যাবেন, মাসুদ ভাই?' গাড়ির পিছন থেকে জানতে চাইল স্বাতী।

'না। আমি আয়ারল্যান্ডে যাচ্ছি।'

যেন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ডোনা, টপ্ করে বলল, 'তাহলে আমাকে অন্তত আপনার সঙ্গে নেয়া উচিত। আমি আইরিশ, আয়ারল্যান্ডের সব আমি চিনি। পুলিস বিভাগ আর আর্মিতে আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার বাবার বন্ধু...'

'তোমরা, বিশেষ করে তুমি,' বলল রানা, 'লন্ডন আর আমার মাঝখানে লিয়াযোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করবে। আমার সঙ্গে যাবার চেয়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, ডোনা। তোমার যে-সব কানেকশনের কথা বলছ, অ্যালডারশট বেসে বসেও সেগুলো তুমি কাজে লাগাতে পারবে।'

ম্লান সুরে স্বাতী বলল, 'আপনি যা-ই বলুন, মাসুদ ভাই, আমার এটাকে লিলিপিউশিয়ান, মানে আর কি খুবই নগণ্য একটা কাজ বলে মনে হচ্ছে।'

রানা গম্ভীর হয়ে গেল, তবে উত্তর দেয়ার সময় পেল না। জানালার পাশে ফিরে এসে পরিচয়-পত্রগুলো ফিরিয়ে দিল গার্ড। 'ঠিক আছে, স্যার, আপনাদেরকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' উইন্ডস্ক্রীন ওয়াইপারের নিচে একটা ভিজিটর কার্ড গুঁজে দিল সে, তারপর আবার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। 'কর্নেল ও মিসেস রিচমন্ড এই মুহূর্তে অফিসার্স ক্লাবে রয়েছেন। এখুনি তাঁরা ফ্ল্যাটের উদ্দেশে রওনা হবেন, সেখানেই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। আপনি সামনের ওই রোভারটাকে অনুসরণ করুন, প্লীজ, স্যার। তা না হলে অন্ধকারে পথ চিনতে সমস্যায় পড়বেন।'

গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছাড়ল রানা, ইতিমধ্যে পার্কিং এরিয়া থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে রোভারটা। বহু দূরে আলোর একটা সারি দেখা যাচ্ছে, রোভারের পিছু নিয়ে সেদিকে ছুটল স্যাব। পাঁচ মিনিট পর লম্বা ও আধুনিক এক সারি তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে থামল রোভার। ড্রাইভার নেমে

এসে স্যাবের জানালার পাশে দাঁড়াল। 'কর্নেল রিচমন্ড একশো বাইশ নম্বরে থাকেন, স্যার। ফেরার পথে আপনার যদি গাইড দরকার হয়, আমি তাহলে অপেক্ষা করি।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু ফিরতে আমাদের দেরি হতে পারে।'

'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে গেটে আপনি টেলিফোন করলে ফিরে এসে নিয়ে যাব আপনাকে, স্যার।' স্যালুট করে রোভার নিয়ে ফিরে গেল গার্ড। পার্কিং স্পেইসে ঢুকে গাড়ি থামাল রানা।

রানা কি করতে চায় শুনে মাথা নাড়ল আয়ারল্যান্ড কাস্টমস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জ্যাক ফেরি। 'না, বন্ধু। আমার অনুমতি ছাড়া আয়ারল্যান্ডে তুমি কিছুই করতে পারো না।'

লেদার চেয়ারে বসে আছে রানা, হাতে দুই কাপ কফি নিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরল ফেরি, ডেস্কের দিকে এগোল, তারপর ভুলটা বুঝতে পেরে আবার ঘুরে রানার হাতে ধরিয়ে দিল একটা কাপ।

'তাহলে জবাব দাও, তোমার লোকেরা এখনও কোন রিপোর্ট করতে পারেনি কেন?'

'মাত্র এক দিন হলো দায়িত্ব পেয়েছে তারা, এখুনি কিভাবে রেজাল্ট চাও তুমি?'

'এই কেসে একদিন অনেক বেশি সময়, ফেরি,' বলল রানা। 'লন্ডনে কি ঘটেছে তোমাকে আমি বলেছি।'

নিজের চেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল ফেরি। 'কি করে বুঝলে কোনও সম্পর্ক আছে?'

'ফেরি,' রানা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চাইছ আইএনসিসি আইরিশ সরকারকে চাপ না দেয়া পর্যন্ত আমাকে তুমি সাহায্য করবে না?'

হেসে ফেলল ফেরি। 'এই না হলে বন্ধু! হুমকি দিচ্ছ তাহলে?'

রানাও হাসল, তবে কিছু বলল না।

'তুমি একটা গোঁয়ার, ব্লাডি বাস...'

'ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিয়ো না,' বলল রানা। 'তুমি যদি সাহায্য করতে রাজি না হও, সেটা পরিষ্কার করে বলো। আমি লন্ডনে ফোন করে জানিয়ে দিই।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে একটানা দশ সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ফেরি। তারপর, যেন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করছে, শিরদাঁড়া খাড়া করে ডেস্কের ওপর হাত দুটো রাখল। 'ঠিক আছে, আমাকে কি করতে হবে বলো।'

'ধন্যবাদ, ফেরি। ওই এলাকা থেকে তোমার সব লোককে ডেকে নাও,' শুরু করল রানা, ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল ঠিক কি চায় ও। রেডিও সহ একটা কার দরকার, পুলিস ফ্রিকোয়েন্সী হলে চলবে না। চলাফেরার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। ফেরি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। সময় হলে ও-ই যোগাযোগ করবে। তবে যখন ডাকবে, কোন রকম সময় নষ্ট না করে আর্মড পুলিস অথবা সৈনিকদের নিয়ে পৌঁছুবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে তাকে। ওর ডাক পাবার পর ফার্মটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে এক ঘণ্টার বেশি সময় নেয়া চলবে না।

ফেরি খানিকটা শ্লেষের সুরে জানতে চাইল, 'এক ঘণ্টার নোটিশে একটা ফার্মকে ঘিরে ফেলার মত যথেষ্ট সংখ্যক পুলিস বা সৈন্য কোথায় পাব আমি? এটা কি গ্রেট ব্রিটেন, না ইউনাইটেড স্টেটস? গোটা সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র লোক বিশ হাজারও হবে না, আর পুলিসের সংখ্যা দু'হাজারেরও কম।'

'সেটা তোমার সমস্যা। এখনই ওদেরকে ডেকে পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝিয়ে বলো, তাহলেই ওরা তৈরি হয়ে থাকবে। কারণ আমি যদি ডাকি, পরশুর মধ্যেই ডাকব।' ফেরি মাথা নাড়তে যাচ্ছে দেখে আবার মুখ খুলল রানা, সামনের দিকে খানিকটা

ঝুঁকে, 'একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমার ওপর আস্থা রাখতে বলছি তোমাকে, ফেরি। আমি ডাকলাম, অথচ তোমরা সময়মত পৌঁছুলে না, এরকম যদি ঘটে, গোটা ব্যাপারটা ভেস্তে যাবে। তখন তোমার কি অবস্থা হবে সেটাও একবার ভেবে দেখতে বলি।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে রানার দিকে কটমট করে তাকাল ফেরি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে বলল, 'কতটুকু কি করা সম্ভব কাল সকালে তোমাকে জানাতে পারব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, দরজার দিকে এগোচ্ছে। 'বেশ।' তারপর কি ভেবে থামল। 'বুকটা ফোলাও, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জ্যাক ফেরি। সমস্ত কৃতিত্ব একা তোমাকে দেয়া হবে। তোমাকে আমি হিরো বানাতে যাচ্ছি।'

ঠোঁট ওল্টাল ফেরি। 'ঈশ্বরই জানেন কি করতে যাচ্ছ তুমি,' বলার সুরে খানিকটা সন্দেহ, খানিকটা প্রশংসা। 'আমার তো এখনও সন্দেহ, মরীচিকার পিছনে ছুটতে চাইছ...' হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় হাত তুলে থামতে বলল রানাকে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, ডেস্ক ঘুরে চলে এল ওর সামনে। 'আজ সন্ধ্যায় গ্রেইস্টোনস-এ যাচ্ছি আমি, আমার বোটে। তুমিও আমার সঙ্গে এসো না? খানিকটা রিল্যাকসেশন-এর সুযোগও পাবে, সমস্যাটার খুঁটিনাটি বিষয়ে আলাপও করা যাবে।'

বিস্ময়টা চেপে রাখতে বেশ বেগ পেতে হলো রানাকে। যাকে বলে গোঁয়ার গোবিন্দ সিভিল সার্ভেন্ট, এখনও মাথা নোয়ায়নি! ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্যই লাগল ওর। 'ঠিক আছে,' সকৌতুকে জবাব দিল। 'শুনে মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটবে।'

'ওহ্, দারুণ!' হাসল ফেরি। 'ডাবলিন থেকে কিভাবে পৌঁছুতে হবে ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।' ডেস্কের পিছনে ফিরে এসে কাগজ আর পেন্সিল হাতে নিল। 'কোস্ট ধরে টি-সেভেন

ফলো করবে। সঙ্গে তো গাড়ি আছে, তাই না? ডান লাওঘেয়ার আর ব্রে হয়ে গ্রেইস্টোনস-এ পৌঁছে যাবে। গ্রামে ঢুকে থেমো না, খেয়াল রেখো ম্যারিনা সাইনটা যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়।'

ম্যাপটা হাতে নিয়ে চোখ বুলাল রানা। 'কখন?'

'এই ধরো আটটার দিকে। আমরা বোটেই ডিনার খাব।' হাত মেলাল ওরা, দরজা খুলে দিল ফেরি, বন্ধুত্বের খাতিরে অফিসের বাইরে পর্যন্ত আসছে রানার সঙ্গে, কৌতুক করার স্বভাবটা হঠাৎ আবার ফিরে পেয়েছে। এলিভেটর নিচে নামছে, একা হবার পর বন্ধুবরের আকস্মিক এই পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা করছে রানা। কেন? ফেরি কি অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছে এই অ্যাসাইনমেন্টে সহযোগিতা করলে তারই লাভ? তার লোকরা কি এমন কিছু জানতে পেরেছে বা আবিষ্কার করেছে, রানাকে যা সে বলেনি এখনও?

আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে গ্রেইস্টোনস-এর নিস্তব্ধ নিঃসাড় জেলে পাড়ায় ঢুকল রানার ভাড়া করা অস্টিন। সরু রাস্তা আর নিচের নুড়ি ছড়ানো সৈকতকে আলাদা করে রেখেছে নিচু একটা পাথরের পাঁচিল। দূর সৈকতে সাগরের বাতাসে শুকাতে দেখা গেল কয়েকটা মাছ ধরার জাল, তবে জেলে বা তাদের বোট কোথাও চোখে পড়ল না।

পাকা রাস্তাটা ক্রমশ নিচু হয়ে ছোট একটা বে-তে নেমে গেছে, সেখানে বেশ কয়েকটা মোটর আর সেইলিং ক্রাফট দু'তিন লাইনে বাঁধা রয়েছে। ছোট একটা গাইড রোড সৈকতের দিকে চলে গেছে, এক ধারে একটা সাইনবোর্ড–সাদার ওপর সবুজ হরফে লেখা 'ম্যারিনা', তীর চিহ্নটা আধ মাইল দূরের ডকটাকে নির্দেশ করছে। বাঁক ঘুরে সেদিকে যাচ্ছে রানা।

প্রায় খালি কার পার্কে থামল অস্টিন। সূর্য দিগন্ত ছুঁতে যাচ্ছে,

সেই সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে বাতাস। রানা গাড়ি থেকে নামতেই একটা চিৎকার ভেসে এল। 'রানা! এদিকে!'

গাড়ির ওপর দিয়ে তাকাতে জন ফেরিকে দেখতে পেল রানা, ডক থেকে নেমে রাস্তা ধরে প্রায় ছুটে আসছে, হাত দুটো সামনে বাড়ানো। 'সত্যি তুমি এলে! দারুণ! এসো আমার সঙ্গে, একটু পরই আমরা ডিনারে বসব। গাড়িটা এখানেই থাক, ব্যাগগুলোও পরে নামাব–কেউ ছোঁবে না।'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখল ফেরি, বন্ধুকে নিয়ে ডকে উঠে এল। পালিশ করা চকচকে অনেকগুলো ইয়ট দেখা যাচ্ছে এক লাইনে। রানাকে মাথা নেড়ে আপনমনে হাসতে দেখে বিস্মিত হলো ফেরি, জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'না–তোমাকে সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না, তাই হাসছি।'

রানার সঙ্গে এবার ফেরিও হেসে উঠল। 'আরে ভাই, যৌবনটা উপভোগ করার এই তো সময়! সরকারী চাকরি করি বলে জীবনটাকে মরুভূমি বানিয়ে ফেলতে হবে, এ আমি মানতে রাজি নই।' গাঢ় রঙের স্যুটের বদলে ক্রীম কালার স্ল্যাকস পরেছে সে, গলার কাছে বোতাম খোলা লাল ও সাদা ডোরা কাটা শার্ট, শার্টের ওপর স্পোর্টস জ্যাকেট। কাস্টমস অফিসে দেখা ফেরিকে রানা সত্যি চিনতে পারছে না, বয়েস যেন বিশ বছর কমে গেছে।

'আমরা পৌঁছে গেছি,' বলে চল্লিশ ফুট লম্বা চকচকে একটা মোটর ইয়ট দেখাল ফেরি। ইয়ট একটা চমক, তারচেয়ে বড় চমক ওদের জন্যে অপেক্ষারত মেয়ে দুটো। ডেকে পা দিয়েই তাদের হাত ধরল ফেরি, হেসে উঠে বলল, 'দেখো, বন্ধু, তোমার জন্যে কেমন সারপ্রাইজের ব্যবস্থা করেছি। এ হলো মিরিন্ডা জোনস,' স্বর্ণকেশী মেয়েটাকে দেখাল, তার বাম দিকে দাঁড়িয়ে আছে। 'আর এ হলো পলা বারবি।' দু'জনেই অসম্ভব সুন্দরী আর

একহারা। 'এরা আমার পুরানো বান্ধবী, আশা করা যায় সময়টা আমাদের ভালই কাটবে।'

এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল পলা। 'হ্যালো,' ফিসফিস করল সে। 'ফেরি আমাকে বলেছে তুমি নাকি নারকটিকে আছ।'

'কি?' বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়ে এক পা পিছাল রানা।

'ও কিছু না,' হেসে উঠে বলল ফেরি। 'ওদের কাছে গোপন করার কিছু নেই আমাদের। চিন্তার কিছু নেই, ওরা কাউকে কিছু বলবে না। এতে করে বরং ওদের কাছে তোমার গ্ল্যামার...'

'তুমি এত বড় গর্দভ, আমার জানা ছিল না,' রাগ সামলাতে না পেরে বলে বসল রানা। 'তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলো তো...'

ঠোঁট ফোলাল মিরিন্ডা, বিদ্রূপের সুরে বলল, 'ফেরি, তুমি ওর কাভার নষ্ট করে দিয়েছ। ও যে একজন আন্ডারকাভার এজেন্ট, এটা জেনে ফেলা সত্যি উচিত হয়নি আমাদের।'

'এখানে আর আমার থাকা চলে না,' বলে ঘুরতে গেল রানা।

খপ করে রানার একটা হাত ধরে ফেলল ফেরি। 'সরি, ভাই! এই মিরিন্ডা, বাড়াবাড়ি কোরো না তো! এসো, রানা, প্লীজ—এখানে সবাই আমরা বন্ধু। কি দেব বলো। হুইস্কি, নাকি বিয়ার?'

'তোমার সম্মানে আমরাও আজ তোমার পছন্দের জিনিস খাব,' বলল পলা। এসো, রানা, শুরু করো!'

'আমাদের ম্যারিনা কেমন লাগছে তোমার?' দ্রুত জানতে চাইল ফেরি। 'মাত্র গত শীতে তৈরি করা হয়েছে, অথচ এতটুকু জায়গা খালি নেই কোথাও। এখানে পঁচাত্তরটা ইয়ট নোঙর ফেলতে পারে।' মই বেয়ে ককপিটে নামল সে, রানার হাত এখনও ছাড়েনি। বড় একটা প্লাস্টিক ফ্রিজার খুলল অপর হাতে। 'সব রেডি, বুঝলে। না খেলে বুঝবে না ওদের রান্নার হাত কত

ভাল।' ফ্রিজারটা ধরে ঝাঁকাল সে। ওয়াইনের বোতল আর বিয়ারের ক্যানগুলো পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলল। 'তোমার যদি বিয়ার চলে, তাহলে শ্যাম্পেনও চলতে পারে, সে-কথা ভেবে প্রচুর আনিয়েও রেখেছি। আইরিশ ওয়াইন যোগাড় করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সমস্যাটা কোথায় তা তো তুমি জানোই!'

'আইরিশ ওয়াইন নিয়ে কোন সমস্যা আছে নাকি?' মিরিন্ডা জানতে চাইল।

হেসে উঠে ফেরি বলল, 'এটা একটা প্রাইভেট জোক, ডিয়ার, প্রাইভেট জোক।'

রানা সম্পূর্ণ শান্ত ও নির্লিপ্ত, যেন দেখতে চাইছে সীমা ছাড়িয়ে কতটুকু যেতে পারে জ্যাক ফেরি। ককপিটে প্রচুর জায়গা। আগেই সেখানে একটা টেবিল ফেলা হয়েছে। ওরা তিনজন বিয়ার, শ্যাম্পেন, হুইস্কি–যখন যা খুশি খাচ্ছে। 'খাব না,' বলার পর রানাকে ওরা জোর করেনি। টেবিলে সবাই বসার পর মিনিট দশেক পেরিয়ে গেছে। পলার পরনে নামমাত্র কাপড়চোপড়, পা খালি; একটা পা রানার গোড়ালির ওপর তুলে আনল। নিজের পা টেনে নিল রানা, টেবিলের তলা থেকে চেয়ারের তলায়।

বে-র ওপারে জেলেদের খুদে গ্রামটা সূর্য অস্ত যাবার পর ধীরে ধীরে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। একদল অ্যাংলার আর ট্যুরিস্টকে নিয়ে হারবারে ফিরে আসছে একটা ফিশিং বোট। ওদের ইয়টের কাছ থেকেই ষাট ফুটী একটা কেচ নোঙর তুলে রওনা হলো। পুরুষ ও নারীকণ্ঠের হাসি, সেই সঙ্গে গান-বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে ওদিক থেকে।

'ওই আবার রওনা হলো জাঁ লুই পেঁত্রা,' বলল মিরিন্ডা, বলার সুরে ক্ষোভটা চাপা থাকল না। 'লোকটাকে আমি...'

'শান্ত হও, মিরিন্ডা,' সকৌতুকে বাধা দিল ফেরি।

'কেন শান্ত হব!' রাগে হিসহিস করে উঠল মিরিন্ডা। 'ব্যাটা উজবুকটাকে কেউ যদি ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেয়, আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না।'

'জাঁ লুই পেঁত্রা ফ্রান্সের একজন পরিচালক,' রানাকে বলল ফেরি। 'সব কিছু খুব সস্তা বলে আয়ারল্যান্ডে আর্ট ছবি বানাতে এসেছে। নায়িকা করা হয়নি বলে ওর ওপর মিরিন্ডার খুব রাগ।'

'মিরিন্ডা তাহলে অভিনেত্রী?'

'আমরা দু'জনেই,' বলল পলা। 'তবে আমি নতুন, মাত্র গত বছর ঢুকেছি।'

ফেরি বলল, 'পলাকে তুমি চিনতে পারোনি, রানা। গতবারের আগের বার মিস ওয়ার্ল্ড হয়েছিল ও।' চেয়ার ছেড়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল সে, পিছু নিয়ে পলাও। রেইলিঙের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'আমার সম্পর্কে ফেরি তোমাকে কতটুকু কি বলেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেশি কিছু না,' জবাব দিল মিরিন্ডা। 'বেআইনী ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরো তুমি, ব্যস। সত্যিই কি তাই? সারা দুনিয়ায় হেরোইন স্মাগলারদের ধাওয়া করে বেড়াও?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার কাজ আসলে খবরের কাগজ পড়া আর একের পর এক রিপোর্ট লেখা।'

'যাহ্, মিথ্যে কথা! তাই যদি হবে, তাহলে তুমি আয়ারল্যান্ডে এসেছ কেন?'

প্রথমবার উত্তরটা এড়িয়ে গেল রানা। কিন্তু পরবর্তী আধ ঘণ্টায় দেখা গেল এ-ধরনের প্রশ্ন ঘুরেফিরে বারবার তোলা হচ্ছে ওর কানে–কেন রানা আয়ারল্যান্ডে এসেছে, এখান থেকে কোথায় যাবে ও, আফিমের চাষ সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য ওর কাছে আছে কিনা ইত্যাদি। একা শুধু মিরিন্ডা নয়, পলাও জানতে

চাইছে–দু'জন পালা করে।

তারপর ডিনারে বসে ফেরির সামনেই মেয়ে দুটো সরাসরি ওই একই ধরনের প্রশ্ন আবার শুরু করল। এক পর্যায়ে ফেরির দিকে তাকাল রানা; বলল, 'মিরিন্ডা আর পলা, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব, ফেরি? কারণ, আমি যদি মুখ খুলি, তোমাকেও আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

সাবধানে হাসল ফেরি। 'কথাটা ঠিক। এখানে এ বিষয়ে যদি আলোচনা করি আমরা, সবই অত্যন্ত গোপনীয় বলে মনে করতে হবে। কি?'

টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে কম্প্যানিয়নওয়েটা দেখাল। 'বাইরে চলো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

চোখ নামিয়ে বসে থাকল ফেরি। মেয়ে দুটো আড়চোখে দেখছে তাকে। কয়েক মুহূর্ত পর চেয়ার ছাড়ল সে। 'বেশ,' বলে হাত তুলে ইঙ্গিত করল, রানাকে পথ দেখাতে বলছে।

সূর্য ইতিমধ্যে ডুবে গেছে। শহর আর নির্জন ম্যারিনায় শুধু দু'একটা আলো জ্বলছে, বাকি সব অন্ধকার। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ইয়টের পিছন দিকে চলে এল রানা, দাঁড়াল রেইলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে। 'হ্যাঁ, বলো। কি ঘটছে এখানে?'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ফেরি, কালো আকাশের গায়ে কাঠামোটাই শুধু স্পষ্ট, চেহারা দেখা যাচ্ছে না। 'কি ঘটছে মানে?'

'বোটে আমাকে ডাকলে কেন? সেক্স পার্টির উদ্দেশ্যটাই বা কি? তুমি আসলে কি জানতে চাও?'

অন্ধকারে মৃদু শব্দে হেসে উঠল ফেরি। 'মাই ডিয়ার রানা, পেশাটা তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট করে ফেলছে। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হয়েছ বলে কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও প্রতিটি আচরণ সন্দেহের চোখে দেখতে হবে?'

'আমি অপেক্ষা করছি, ফেরি,' কঠিন সুরে বলল রানা।

'কি আশ্চর্য, রানা! আমি একজন ব্যাচেলর। ভারি সুন্দর একটা বোট আছে আমার। সুন্দরী মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে। তুমি আমার পুরানো বন্ধু, তোমাকে আমি পছন্দ করি–সন্দেহের বাতিক থাকা সত্ত্বেও। আজ দুপুরে অফিসে তোমাকে দেখে মনে হলো টেনশনে ভুগছ, তাই ভাবলাম রাতটা ফুর্তিতে কাটানোর ব্যবস্থা করতে পারলে তোমার উপকার করা হবে। মেয়ে দুটোকে তোমার গুরুত্ব না দিলেও চলে। ওরা বুদ্ধিমতী, কৌতূহলী, তাই তোমাকে এত সব প্রশ্ন করছে...'

'প্রশ্নগুলো তুমি ওদেরকে দিয়ে করাচ্ছ,' বলল রানা। 'কেন, ফেরি?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফেরি। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি তাই–প্রশ্নগুলো আমিই ওদেরকে করতে বলেছি। শোনো তাহলে, কারণটাও ব্যাখ্যা করি।' আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। তারপর বলল, 'তুমি বা রানা এজেন্সির অন্য কেউ এখন আর আইএনসিসি-তে নেই, রানা।'

'কখন জানলে?'

'আজ সকালে, তুমি আমার অফিসে আসারও আগে,' বলল ফেরি। 'আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মি. বাউচারকে আমি ফোন করেছিলাম, তিনিই বললেন। এবার, রানা, আমার সমস্যাটা বিবেচনা করে দেখতে বলি তোমাকে। তুমি আইএনসিসি-তে নেই, কাজেই কাস্টমসের তরফ থেকে তোমাকে আমি আয়ারল্যান্ডে কাজ করার অনুমতি দিতে পারি না।'

'সেকথা অফিসে বললেই পারতে, আমি তোমাদের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি চেয়ে নিতাম,' বলল রানা।

অন্ধকার আকাশের গায়ে মাথা নাড়তে দেখা গেল ফেরিকে। 'তখন তোমাকে কিছু বলিনি, কারণ চেষ্টা করে দেখার ইচ্ছে ছিল

রানা এজেন্সিকে আয়ারল্যান্ডে কাজ করার সুযোগ করে দেয়া যায় কিনা।'

'মানে?'

'তুমি অফিস থেকে চলে আসার পর আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি,' বলল ফেরি। 'ফোন করে জানতে পারি, আমার আগে রানা এজেন্সির তরফ থেকে ওদের অফিসে আজ সকালে যোগাযোগ করা হয় অনুমতি পাওয়ার জন্যে। দুঃখিত, রানা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমতি দেয়নি। শুনলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এক বন্ধুকেও ধরা হয়েছিল, কিন্তু তিনিও মন্ত্রীকে রাজি করাতে পারেননি।'

হকচকিয়ে গেছে রানা। রানা এজেন্সির তরফ থেকে কাজ করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে, অথচ ও এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না! নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করে রানা ফেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, তোমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমতি দিতে আপত্তি করছে কেন?'

'আইনগত বিধি-নিষেধই প্রধান সমস্যা,' বলল ফেরি। 'বিদেশী কোন সংস্থা, সরকারী হোক বা বেসরকারী, আয়ারল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে পারে না, তাতে সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হয়। তারপরও অবশ্য নির্দিষ্ট কোন অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ কেউ যদি দাখিল করতে পারে, তদন্ত করার অনুমতি দেয়ার ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখা হয়। কিন্তু তুমি তো তা-ও পারোনি।'

রানার কিছু বলার নেই।

অন্ধকারে পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট ধরাল ফেরি। 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, রানা। বিশ্বাস করো, তোমাকে সত্যি আমি সাহায্য করতে চেয়েছি। এখনও চাই। কিন্তু বুঝতেই পারছ, আমার হাত-পা বাঁধা।'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা, কথা বলছে না।

'এখন তুমি কি করবে?' অবশেষে আসল কথাটা জানতে চাইল ফেরি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না। তুমিই আমার শেষ ভরসা ছিলে। আরেকটা সম্ভাবনা ছিল, তুমি যাদেরকে তদন্ত করতে পাঠিয়েছ তারা কোন সূত্র বা প্রমাণ পাবে, কিন্তু পায়নি।'

'তাহলে হাল ছেড়ে দিচ্ছ তুমি?'

'অগত্যা। তোমাদের অনুমতি ছাড়া তো আর আয়ারল্যান্ডে কাজ করা সম্ভব নয়, তাই না?'

'না, সম্ভব নয়। দুঃখিত।'

'তাহলে বিদায়, ফেরি। শুধু একটা কথা বলে যাই, পরে বোলো না যে তোমাদেরকে আমি সাবধান করিনি।'

রানার কাঁধে হাত রাখল ফেরি। 'বলব না, রানা। কারণ, তদন্তটা আমি চালিয়ে যাব। তবে ধীরে-সুস্থে, সাবধানে।'

'বেশি সাবধান হতে গিয়ে আঙুলের ফাঁক গলে ওদেরকে আবার বেরিয়ে যেতে দিয়ো না।'

হেসে উঠল ফেরি। 'এ নিয়ে কোন চিন্তা কোরো না তো। চলো, রাতটা আমরা আনন্দে কাটাই। মিরিন্ডা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, ফেরি। ধন্যবাদ। আজ রাতেই আমি ডাবলিনে ফিরে যাব। সকালের প্রথম ফ্লাইটে আমাকে লন্ডনে পৌঁছুতে হবে।' ফেরিকে পাশ কাটিয়ে ডকে উঠে এল রানা।

পিছন থেকে ফেরি বলল, 'লন্ডন থেকে কলকাঠি নেড়ে তুমি যদি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি আদায় করতে পারো, আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না, রানা। সেক্ষেত্রে ফিরে এসো তুমি, কথা দিচ্ছি সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা পাবে তখন।'

রানা কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না।

পাঁচ

এখনও ভোর হয়নি। অস্টিনে বসে টর্চের আলোয় ওয়ান-ইঞ্চ স্কেল ম্যাপটা পরীক্ষা করছে রানা। পুব দিকের আকাশে সামান্য একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। নিচের পচা কাদা ভর্তি জলা থেকে কয়েকশো ব্যাঙের হাঁক-ডাক ভেসে আসছে।

মাঝরাতে গ্রেইস্টোনস থেকে রওনা হয়ে একশো ষাট মাইল দূরে চলে এসেছে রানা, উদ্দেশ্য ছিল টি-টোয়েনটিএইট হাইওয়ের পাশের একটা গ্রাম, ক্যাসল আইল্যান্ড থেকে চার মাইল উত্তরে পৌঁছানো। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই দেখে রাস্তা ছেড়ে একটা মেঠো পথ ধরে ও, সম্ভবত ভেড়াদের চলাফেরায় তৈরি হয়েছে। ওই পথ ধরে উঠে এসেছে নকাকিন পাহাড়ের ঢালে। এখানে কিছু গাছপালা আছে, গাড়িটা লুকিয়ে রাখতে পারবে।

জিম ফিশারের কাছ থেকে পাওয়া স্যাটেলাইট ম্যাপ অনুসারে অ্যাবিফিল গ্রাম থেকে নকাকিন পাহাড় এগারো মাইল দক্ষিণ-পুবে। কিন্তু গ্রামের কোন দিকে ভিনিয়ার্ডটা পাওয়া যাবে ম্যাপটা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেও বুঝতে পারছে না রানা। অ্যাবিফিলকে ঘিরে থাকা কাঁচা-পাকা অনেকগুলো রাস্তা আছে, স্যাটেলাইট ফটোয় সেগুলো পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ফটোগ্রাফে চিহ্নিত ফার্মটা খুঁজে পাচ্ছে না। ধারণা করল, শহর বা গ্রাম যাই বলা হোক, অ্যাবিফিল থেকে দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হবে সেটা। বেপরোয়া লোকের কপালে বিশ্রাম নেই, আপনমনে

বিড়বিড় করল ও, ম্যাপটা ভাঁজ করে রাকস্যাকের পকেটে রেখে দিল।

লন্ডন ছাড়ার আগেই রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফার্মটাকে খুঁজে বের করার জন্যে একা যাওয়াই সব দিক থেকে নিরাপদ। শীতকালটা বাদে বাকি প্রায় সব মরশুমেই ব্রিটিশ আইলস-এর সর্বত্র হাইকার আর ক্যাম্পারদের দেখা যায়, দৃশ্যটা এত পরিচিত যে কেউ তাদের দিকে ভাল করে ফিরেও তাকায় না। আয়ারল্যান্ড চিরকালই দরিদ্র দেশ, এমনকি জনশক্তির দিক থেকেও। উগ্র, আত্ম-বিধ্বংসী একটা জাতি; বিশেষ করে ইয়েটস আর জয়েস পড়লে সেটা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। দু'জনেই তাঁরা আপাদমস্তক আইরিশ, এবং বেশিরভাগ আইরিশদের মত আদর্শের প্রতি এত বেশি নিবেদিত ছিলেন যে বাস্তব দুনিয়ায় তাঁদের আর কোন গুরুত্ব থাকেনি। একটা আদর্শকে রক্ষা করার জন্যে আইরিশরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তার প্রমাণ, একই ধর্মের নগণ্য পার্থক্যের কারণে পরস্পরকে তারা শত শত বছর ধরে খুন করে আসছে। আয়ারল্যান্ড আজও যেন সতেরো শতাব্দীতে স্থির হয়ে আছে। একই ধর্মের অন্য শাখার লোককে যেখানে তারা সহ্য করতে পারে না, বিদেশী অন্য কোন ধর্মের লোককে তারা কি চোখে দেখবে তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্যেই জ্যাক ফেরির আচরণে খুব একটা বিস্মিত হয়নি রানা।

ফার্মটাকে খুঁজে বের করা আর ফার্মের ভেতর ঢোকা, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সেখানে যে কড়া পাহারা থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, গার্ডদের কাছে অত্যাধুনিক ডিটেকশন ডিভাইসও থাকবে বলে ধরে নিয়েছে রানা।

অ্যালডারশট থেকে দুটো সুবিধে পেয়েছে রানা। বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির মাঝখানে, অতি বিশ্বস্ত বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীর হাতে ডোনা ও স্বাতীকে রেখে আসতে পেরেছে। উপরি

পাওনা হিসেবে ধার পাওয়া গেছে একটা লেটেস্ট মিলিটারি রিকনাইসন্স ক্যামেরা আর বিশেষ ধরনের একটা স্যুট।

সিনে ক্যামেরার মত দেখতে ক্যামেরাটা, তবে প্রয়োজনে মধ্যরাতে কয়লার স্তূপে কালো একটা বিড়ালের প্রতিটি নড়াচড়াও রেকর্ড করতে পারবে। নানা রকম যান্ত্রিক সুবিধে থাকা সত্ত্বেও পুরো লোড করা ব্যাটারি সহ ওটার ওজন দু'পাউন্ডও নয়।

কাঁধে মেটাল কেসে ভরা ক্যামেরা, হাতে রাকস্যাক, গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাকস্যাকের ফ্রেমে একটা স্লীপিং ব্যাগ আটকানো আছে, বাইরের দিকের পকেটগুলোয় আছে চকলেট বার আর রেশন, হোলস্টারে রয়েছে প্লাস্টিকের একটা ক্যানটিন। লন্ডন ছাড়ার আগে রাকস্যাকে কিছু কাপড়চোপড় ভরেছে রানা। সেলাই করা একটা ফ্ল্যাপ-এর ভেতর লুকানো আছে ছোট্ট একটা ওয়ালেট, তাতে এক ও পাঁচ পাউন্ডের নোট আছে, সব মিলিয়ে তিনশো পাউন্ড। আরেক ফ্ল্যাপে রিভলভারের জন্যে রেখেছে এক বাক্স অতিরিক্ত অ্যামিউনিশন, এয়ারপোর্টের মেটাল ডিটেক্টরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে লেড ফয়েলে মোড়া। ব্যাটারি জাম্পার ওয়্যার সহ আরও টুকিটাকি বেশ কিছু জিনিস সঙ্গে রেখেছে, কাজে লাগতে পারে ভেবে।

রাকস্যাকটা তুলে স্ট্র্যাপগুলো বগলের তলায় আটকাল রানা, এত কিছু ভরা সত্ত্বেও ওজন বিশ পাউন্ডের বেশি হবে না। হুডের নিচে ম্যাগনেটিক কেসে গাড়ির স্পেয়ার চাবিটা আছে কিনা দেখে নিয়ে দরজায় তালা লাগাল, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল পাহাড়ে।

মাত্র এক মাইল পেরিয়েছে রানা, পুরোটা সূর্য আকাশে উঠে এল। হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে, কারণ পাহাড়ী পথ খুব খাড়া আর হাঁটু-সমান বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন গাছের চওড়া পাতাগুলো পা

জড়িয়ে ধরে। সূর্য ওঠার খানিক পরই জমিনের কাছাকাছি জমাট বাঁধল ঘন কুয়াশা, ফলে সামনে মাত্র কয়েক গজ দেখতে পাচ্ছে ও, চারপাশে ম্লান সবুজ গাছপালা বা ঝোপ-ঝাড়। সঙ্গে কম্পাস না থাকলে পথ হারিয়ে একই জায়গায় বারবার ফিরে আসতে হত।

আর একটু বেলা হতেই কুয়াশা মিলিয়ে গেল, ঝাপসা নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে প্রায় গোলাকার গ্ল্যানরাডারী পাহাড়ের মাথা। গোটা এলাকা সম্পূর্ণ নির্জন, এমনকি কোথাও একটা ভেড়াও চরছে না। একবার একটা ধুলো ঢাকা রাস্তা পেল, মানুষের পায়ের বা গাড়ির চাকার পুরানো কোন দাগও চোখে পড়ল না। এক সময় রাস্তার দু'পাশে পাথরের পাঁচিল ছিল, তবে বহুকাল আগেই তা ভেঙে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে।

আকাশে মেঘ নেই বললেই চলে, সূর্য ক্রমশ মাথার ওপর উঠে আসছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে বাতাসের মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের বদলে পায়ের নিচে এখন ঘাস, এদিক সেদিক বুনো ফুলও ফুটে আছে। একের পর এক অনেকগুলো পাহাড় পিছনে ফেলে এসেছে রানা, কোনটাই দু'হাজার ফুটের বেশি উঁচু নয়। যেদিকেই তাকিয়েছে, কোথাও কোন মানুষজন বা ঘর-বাড়ি দেখেনি।

শেষ বিকেলের দিকে গাছপালায় ঢাকা একটা চূড়ায় পৌঁছুল রানা। ধারণা করল যেখানে ফার্মটা থাকার কথা সেখান থেকে আধ মাইল দক্ষিণে রয়েছে ও। নিচের উপত্যকাটা দেখার জন্যে গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখে বিনকিউলার তুলল। ওর আর উপত্যকার মাঝামাঝি দূরত্বে একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস লাফ দিয়ে কাছে চলে এল—একরের পর একর জুড়ে বিরাট একটা এলাকা সবুজাভ নাইলন-এর চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

মৃদু শব্দে শিস দিল রানা, বিনকিউলারটা একদিক থেকে

আরেকদিকে ঘোরাচ্ছে। না, দৃষ্টির কোন ভ্রম নয়; সবুজ নাইলন দিয়ে মাঠগুলো ঢেকে ফেলা হয়েছে। চাদরগুলো বিশাল, জমিন থেকে দশ কি বারো ফুট ওপরে শামিয়ানা বা চাঁদোয়ার মত লাগছে দেখতে, প্রতিটি মাঠ বা খেত পুরোপুরি আড়াল করে রেখেছে। দূরতম প্রান্তে, একটা ভিনিয়ার্ড যেখানে পাহাড়ের এক পাশ ছাড়িয়ে আরও সামনে প্রসারিত, সেখানে ধাতব কিছুর ওপর রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল। পিঠ থেকে রাকস্যাক নামাল রানা, ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো, তারপর আবার পাহাড়টার দিকে ফোকাস করল বিনকিউলার।

পাহাড়ের কিনারা ধরে ধীরগতিতে এগোচ্ছে দুটো ট্র্যাক্টর, একটার পিছনে ট্রেইলর রয়েছে, ট্রেইলরের ওপর বসানো হয়েছে বিরাট একটা ড্রাম। রানার চোখের সামনেই ঘটছে খেত আড়াল করার প্রক্রিয়া–ড্রামটা ঘুরছে, সেই সঙ্গে ওটায় জড়ানো সবুজ রিবন বেরিয়ে আসছে, লোকজন ধরাধরি করে বিশ-বাইশ ফুট অন্তর বসানো উঁচু পোস্টে আটকাচ্ছে সেটা।

পাহাড়ের ঢালে, দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ চাদরের বিস্তৃতি দেখতে পাচ্ছে রানা। ভিনিয়ার্ডগুলোকে দূর থেকে ঘিরে রেখেছে বাতাস ঠেকানোর বেড়া বা পাঁচিল, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে, মিলিয়ে গেছে হালকা কুয়াশার ভেতর। বেড়ার গায়ে খুদে সাদা প্ল্যাকার্ড দেখা যাচ্ছে খানিক পরপর, সম্ভবত সাইনবোর্ড, অনধিকার প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তারপর রানা লক্ষ করল বেড়ার প্রতিটি পোস্টে লাল ক্লি যেন রয়েছে। বিনকিউলার সাবধানে ফোকাস করল ও। ওগুলো ইনসিউলেইটর, প্রতিটি পোল-এ চারটে করে, বসানো হয়েছে ষোলো থেকে আঠারো ইঞ্চি ব্যবধানে। প্ল্যাকার্ডে অনধিকার প্রবেশ নিষেধ করা হয়নি, ঘোষণা করা হয়েছে বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড।

পাহাড়-চূড়ার মাথায় রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে

মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে একটা বীচ ট্রী, জমিন থেকে ষাট ফুট ওপরে চারদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে। গাছটার তলায় এসে রাকস্যাকটা ঘাসের ওপর ফেলে ওপর দিকে তাকাল ও। দশ ফুট মোটা কাণ্ড থেকে গাঁট বহুল ডাল গজিয়েছে, উঠে গেছে ওপর দিকে। মনে হলো ডালে ডালে কয়েকশো পাখি আড্ডা জমিয়েছে। বিকেলটা এতই নিস্তব্ধ যে পোকা-মাকড়ের প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা।

গাছের তলায় বসে চিন্তা করছে ও। ফার্মটা এখন মাত্র সিকি মাইল দূরে। প্রিয় শিষ্যকে চিরকালের জন্যে হারাতে হয়েছে ওকে, নানাজনকে সন্দেহ করতে হয়েছে, পুরানো বন্ধুর আচরণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে মনে, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এতদূর একা আসতে হয়েছে, সব কিছুর জন্যে দায়ী এই ফার্মটা। অনেক কিছুই এখন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ট্রলার মাস্টার গুচম্যান মাঝ সমুদ্রের কোথাও জাপানী কোন জাহাজ থেকে পনেরো কেজি হেরোইন সংগ্রহ করেনি, আয়ারল্যান্ডের কোন উপকূলে ভিড়েছিল সে। অ্যাসিটিক হাইড্রাইড-এর উৎস হলো এই ফার্মটা–এখানে শুধু আফিমের চাষ হয় না, আফিম থেকে হেরোইনও তৈরি করা হয়। জিম ফিশারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। দু'দফায় পাঠানো তার স্যাটেলাইট ফটো না পেলে ফার্মটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

এ-ধরনের নাইলনের চাঁদোয়া আমেরিকার কানেকটিকাট রিভার ভ্যালীতেও দেখেছে রানা। চাঁদোয়া থাকায় টেমপারেচার আর হিউমিডিটি কিউবার সমতুল্য পর্যায়ে উঠে আসে, ফলে এক হাজার মাইল উত্তরে হাভানা চুরুটের জন্যে প্রয়োজনীয় উন্নত মানের তামাক চাষ সম্ভব হয়। ওই একই পদ্ধতি এখানেও গ্রহণ করেছে সিন্ডিকেট। শামিয়ানা ব্যবহার করে আফিম চাষের উপযুক্ত টেমপারেচার বাড়ানো হয়েছে। চাঁদোয়া বা তাঁবু, যাই বলা হোক,

ওটার নিচে আফিম চাষ করায় স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় তা ধরা পড়ছে না। তবে ফার্মটায় শুধু যে আফিমের চাষ হচ্ছে, তা বোধহয় নয়। ক্যামোফ্লেজ হিসেবে আঙুরও নিশ্চয়ই ফলানো হচ্ছে। এখানকার ভিনিয়ার্ড থেকে ওয়াইনও তৈরি করা হয়, কাভার হিসেবে সেটাও খুব কাজে আসছে।

আয়ারল্যান্ডে রানা পাসপোর্ট আর ভিসা নিয়েই ঢুকেছে, কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে এ-দেশে কাজ করার প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া যায়নি। আয়ারল্যান্ড সরকার যতই স্পর্শকাতর হোক, নিরেট তথ্য-প্রমাণ দেখাতে পারলে সরকারের টনক নড়বে, তখন সহযোগিতা না করার কোন কারণ থাকবে না। ফেরিও ওকে প্রায় সে-কথাই বলেছে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে ভিনিয়ার্ডটা স্রেফ একটা ভিনিয়ার্ডই? সিকিউরিটি সিস্টেমেরও সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, ফার্ম মালিকরা তাদের ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে বৈধ ব্যবস্থা নিয়েছে। আয়ারল্যান্ডে তারা যদি বিশাল একটা ভিনিয়ার্ড তৈরি করতে পারে, আইরিশ ওয়াইনের জন্যে বিরাট একটা মার্কেট খুলতে বাধা কোথায়?

তবে না, অ্যাসিটিক হাইড্রাইড যখন পাওয়া গেছে, এখানে অবশ্যই আফিম থেকে হেরোইন তৈরি হচ্ছে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে পাঁচটা বাজে। সূর্য অস্ত যেতে আরও চার ঘণ্টা বাকি। অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত নড়াচড়া করা উচিত হবে না, সেজন্যে হয়তো আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওকে। সারা শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট, প্রচণ্ড ঘুমও পাচ্ছে। সময়টা কাজে লাগানো দরকার।

গাছ বেয়ে উঠল রানা, চল্লিশ ফুট ওঠার পর দেখল মোটা দুটো ডাল এক হয়ে একটা প্লাটফর্ম তৈরি করেছে। শুয়ে-বসে থাকার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। রাকস্যাকটা

মাথার ওপর ছোট একটা ডালে ঝুলিয়ে রাখল, হাত বাড়ালেই নাগাল পাবে।

শরীর খুবই ক্লান্ত, তবু ঘুমোবার আগে চোখে আরেকবার বিনকিউলার তুলে ফার্মটার দিকে তাকাল রানা, সামনের ডালপালা আর পাতা পরিষ্কার করে দূরে তাকাবার জন্যে একটা ফাঁক তৈরি করেছে।

দু'পাশে নিচু পাহাড় থাকায় মাঝখানটা ইংরেজি ভি হরফের মত দেখতে, তবে তেমন গভীর নয়, ওই ভি-র ভেতর ফার্মের বড় একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। রানার দৃষ্টি ওখানে পৌঁছাচ্ছে ভিনিয়ার্ডের একটা অংশের ওপর দিয়ে, যে অংশটা আগেই চাঁদোয়া দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। ভিনিয়ার্ডের ওই অংশের পরেই ফার্মের মূল উঠান, উঠানের এক পাশে এক সারিতে নিচু কয়েকটা বিল্ডিং। মেইন ইয়ার্ডটাকে ঘিরে রেখেছে পাঁচটা শেড আকৃতির গোলাঘর, একপাশে জর্জিয়ান স্টাইলের একটা বাড়ি। শেডগুলোর কাঠামো ধাতব, প্রতিটি একতলা, কোনটায় কোন জানালা নেই। একটা শেডের আড়াল থেকে সবুজ রঙের ভ্যান বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, গাড়ি-পথ ধরে আরেক শেডের আড়ালে চলে গেল। তারপর আর কোন নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। মেইন ইয়ার্ডে কোন লোকজন নেই। তবে সবুজ রঙের একটা লরি দেখা যাচ্ছে, পিছনে ট্রেইলর সহ, একটা বিল্ডিঙের সামনে পার্ক করা। ট্রেইলরের গায়ে লেখা রয়েছে–'গোস্ট ভ্যালী ভিনিয়ার্ড'। বিল্ডিংটার পাশে রয়েছে একটা হেলিকপ্টার, লরি আর ট্রেইলরের মতই সবজু রঙ করা।

মূল ভিনিয়ার্ডও ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভাইন-এর যে অংশ তাঁবু দিয়ে ঢাকা নয়, সেখানে পাঁচ ফুট ব্যবধানে সারি সারি চারা লাগানো হয়েছে, প্রতিটি সারি নিখুঁত সরলরেখার মত দেখতে, মিলিত হয়েছে প্রধান আইলে, সেটা

আবার প্রতিটি সেকশনকে আলাদা করেছে। দু'পাশের সরু আইলগুলো সমান্তরাল রেখার মত।

আর কিছু নেই যা দেখে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কাছাকাছি বেড়ার দিকে আবার মনোযোগ দিল রানা। মাটি বা পাথরের একটা ঢিপির ওপর দিয়ে চলে গেছে সেটা। ওখানকার বেড়া বাকি অংশের চেয়ে দুই কি তিন ফুট বেশি উঁচু। রহস্যটা কি চিন্তা করছে ও, হঠাৎ ব্যাপারটা ধরতে পারল। বর্তমান ফার্মের একটা অংশকে ঘিরে রেখেছিল এমন একটা প্রাচীন পাথুরে পাঁচিলকে কাজে লাগিয়েছে মালিকরা। ভেজা মাটির এই দেশে দশ-বিশ বছরের মধ্যে পাঁচিলগুলো যার যার নিজের ওজনেই ডেবে যায়, এক সময় ঘাস মোড়া ঢিবির মত লাগে দেখতে। এ-ধরনের ঢিবি বা প্রাচীন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ গ্রেট ব্রিটেন ও নিউ ইংল্যান্ডেও দেখেছে রানা।

আর কিছু আপাতত দেখার নেই। বিনকিউলার রেখে দিয়ে জোড়া ডালের ওপর শুয়ে পড়ল রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুম চলে এল চোখে।

হাতঘড়ির অ্যালার্মে ঘুম ভাঙার পর রানা দেখল চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে, বাতাসে ভেজা ভেজা একটা ভাব। জ্যাকেট পরল ও, রাকস্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে এল গাছ থেকে। আকাশে দ্রুতগতির মেঘ, দূরে কোথাও বোধহয় বৃষ্টি হচ্ছে, অন্তত বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে তাই মনে হলো। পাহাড়-চূড়ার কিনারায় এসে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও, চোখে বিনকিউলার তুলে বেড়ার লাইনটা খুঁজছে। অন্ধকার এতই গাঢ় যে অস্পষ্ট আকৃতি দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটা কি। দূরে, প্রায় মাইলখানেক হবে, মুহূর্তের জন্যে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। ওদিকটাতেই ফার্ম বিল্ডিংগুলো থাকার কথা।

দাঁড়াল রানা, গাছের তলায় ফিরে এসে কাপড়চোপড় ছাড়ল। রাকস্যাক থেকে বেরুল বন্ধু কর্নেল রিচমন্ড-এর কাছ থেকে ধার করে আনা টাইটফিটিং কভারঅলস। স্যুটটা এক প্রস্থ নাইলন-এর ওপর কয়েক প্রস্থ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। বুকের কাছে একজোড়া ভেন্টিলেশন ফ্ল্যাপ আছে, স্যুটটা পরার পর যিপ খুলে ফ্ল্যাপ দুটো আপাতত ভাঁজ করে ভেলক্রো স্ট্রিপ-এ আটকে রাখল। একই উপকরণ দিয়ে তৈরি বুট পরল, মাথায় চাপাল নাইলন হুড, সেটার ফেস প্লেট স্যুটের গলা বা কলারের সঙ্গে আটকানো যায়। প্যাক থেকে চারকোনা একটা প্লাস্টিক বক্স বের করে বেল্টে ফিট করল। বক্স থেকে টেপ লাগানো লেড বেরিয়েছে, মাথায় এয়ারফোন, নাইলন হেলমেটের সঙ্গে আটকাল; দ্বিতীয় লেডটা জোড়া লাগাল ফেস প্লেট ওপেনিং-এর ঠিক ওপরে। সুইচে চাপ দিয়ে ফেস প্লেট বন্ধ করতেই প্লাস্টিকে বসানো চোখ-আকৃতির একটা পীস বা অংশ ম্লান সবুজ আভা ছড়াতে শুরু করল, সেই সঙ্গে আশপাশ থেকে ভোজবাজির মত রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল, জমিনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার ধরা পড়ছে দৃষ্টিতে। সাবধানে চারদিকে ঘাড় ফেরাল রানা। সমস্ত দৃশ্য সবুজ আর সাদা শেডে দেখতে পাচ্ছে, তবে সবই বেশ স্পষ্ট। হেলমেটে বসানো একটা বোতামে চাপ দিল ও, দৃশ্যটা আবার কালো হয়ে গেল।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার সুইচ অন করল রানা, মাটিতে হাঁটু গেড়ে কাপড়গুলো রাকস্যাকে ভরে রাখল। মেটাল বক্স থেকে ক্যামেরাটা বের করে গলায় ঝুলিয়েছে, বুকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। রাকস্যাক ফ্রেমটা তুলে নিয়ে বেড়াটা উদ্দেশে রওনা হলো এবার।

জিম ফিশারের কাছ থেকে পাওয়া স্যাটেলাইট ফটোগুলো কয়েক ঘণ্টা পরীক্ষা করেছে রানা। একটা কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছে ও। খোলামেলা গ্রাম্য এলাকার মাঝ-মধ্যিখানে হওয়া

সত্ত্বেও, ফার্মটার কোথাও বিশেষ ধরনের কোন সিকিউরিটি সিস্টেমের অস্তিত্ব ক্যামেরায় অন্তত ধরা পড়েনি। হাইকার বা ট্যুরিস্টরা গেট ছাড়া ফার্মের যে-কোন দিক থেকে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। নাইলনের চাঁদোয়া এক ধরনের ক্যামোফ্লেজ তৈরি করলেও, ইলেকট্রিফায়েড বেড়ার সামনে কোথাও আরও কিছু থাকার কথা। গার্ডও না থেকে পারে না, কৌতূহলী লোকজনকে তাড়াবার জন্যে। আয়ারল্যান্ডে ভিনিয়ার্ড, মানুষ তো শোনা বা দেখামাত্রই আকৃষ্ট হবে। অথচ স্যাটেলাইট ফটোতে গার্ড দেখা গেছে শুধু ফার্মের গেটে।

খুঁতখুঁতে ভাবটা মাথায় ছিল, সেজন্যেই কর্নেল রিচমন্ডের কাছ থেকে স্যুটটা ধার হিসেবে চেয়ে এনেছে রানা। এটার ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে, মানুষের শরীর থেকে কোন কেমিকেলকেই অ্যাটমসফিয়ারে বেরুতে দেয় না, সবই স্যুটে তৈরি মাইক্রো-পের ফিল্টারে আটকা পড়ে। কয়েক প্রস্থ প্লাস্টিক আবরণও বিশেষভাবে ডিজাইন করা, আশপাশের এয়ার টেমপারেচার যা থাকবে স্যুটের টেমপারেচারও তারচেয়ে কমবেশি হবে না, তার ওপর বডি হিট পুরোটাই স্যুটের ভেতর আটকে রাখবে, ফলে স্যুট বা স্যুটের ভেতর মানুষটার অস্তিত্ব ইনফ্রা-রেড ডিটেকশন টেকনিকেও ধরা পড়বে না।

গেটের সামনে ছাড়া আর কোথাও সিকিউরিটি সিস্টেম না থাকায় রানা ধরে নিয়েছে ফার্ম পেরিমিটারে কোথাও পারসোনেল ডিটেকটিং সেনসর নিশ্চয়ই থাকবে।

বেড়াটার কাছাকাছি পৌঁছে, ঢিবির পিছনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, তারপর সাবধানে মাথা তুলল। ইনফ্রা-রেড সিস্টেম কাজ করছে, প্রথমে পেরিমিটারটা সার্চ করল। তারপর রাকস্যাক রেখে দু'দিকের বেড়া ধরেই একশো গজ পর্যন্ত এগিয়ে দেখে এল, ঢিবি আর প্রথম সারির ভাইনগুলো পরীক্ষা করল সাবধানে। না,

এদিকে কোন গার্ড বা পারসোনেল ডিটেকটর নেই।

দুই সারি তারে ব্যাটারি জাম্পার কেবল লাগিয়ে মাঝের অংশগুলো কেটে ইলেকট্রিফায়েড বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, ঢিবির ঢালে শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল। হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে বেল্ট থেকে সাইজমিক সেনসর-এর হুক খুলল, সেটা মাটিতে গেঁথে লেডটা হেলমেটে ঢোকাল। একটানা গুঞ্জন জানিয়ে দিল অন্তত একশো ফুট পরিধির মধ্যে ভয় পাবার মত কিছু নেই। ডিটেকটরটা বেল্টে আটকে রেখে ভাল করে চারদিকটা দেখে নিল একবার, তারপর মাথা নিচু করে ফাঁকা জায়গাটা ধরে ছুটল প্রথম সারি ভাইন লক্ষ্য করে।

গাছগুলোর ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ওর চারপাশে সারি সারি গ্রেপ ভাইন। আকাশে মেঘ আছে, তবে বাতাস নেই, থমথম করছে পরিবেশ। কোন শব্দ নেই। দিগন্তরেখার কাছাকাছি থেকে মেঘ ডাকছে শুধু মাঝে-মধ্যে।

বেড়া ডিঙিয়ে এমন এক জায়গায় ঢুকেছে রানা, ঠিক উল্টোদিকেই ফার্মের প্রধান অংশটা। স্যাটেলাইট ফটো অনুসারে ফার্মবিল্ডিংগুলো ভিনিয়ার্ডের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ওর ডান দিকে, প্রায় চারশো গজ দূরে, সারি সারি গাছের মাঝখানে মূল আইল সরাসরি বিল্ডিংগুলোর দিকে চলে গেছে। মূল আইল থেকে একশো ও দুশো গজ ব্যবধানে আরও আইল বেরিয়েছে। মূল আইল থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। বাম দিকে এগিয়ে সরু একটা আইল-এর দিকে চলল।

ভিনিয়ার্ডের ভেতর একশো গজ হাঁটার পর মাথার ওপর শুরু হলো চাঁদোয়া। আরও একশো গজ এগোবার পর প্রথম সারি পপি গাছ চোখে পড়ল। ক্রল করে এগোচ্ছে রানা, আপনমনে হাসছে। গাছগুলো অশ্লীল লাগছে দেখতে। একটা গাছের লম্বা ও সরু কাণ্ড সাবধানে পরীক্ষা করল, মাথায় বালব আকৃতির পড বা শুঁটি।

ফলের চারপাশে কোথাও পাপড়ি নেই, যা আছে তাকে অসম্পূর্ণ পাতা বলা যেতে পারে, তা-ও ফলের গায়ে এমনভাবে সেঁটে আছে যে আলাদা ভাবে চেনা কষ্টকর। ইরানের জিলান ডিস্ট্রিক্টে ঠিক এই গাছই দেখেছিল ঋজু। প্রতিটি চারাগাছ ছ'ইঞ্চি ব্যবধানে রোপণ করা হয়েছে। উবু হয়ে বসে একটা ফল পরীক্ষা করছে রানা। ফেস প্লেইট খুলে ফলটা ঝাঁকাল কয়েকবার। খটখট আওয়াজ বলে দিল পরিণত হতে আর বেশি বাকি নেই।

দু'সারি গাছের মাঝখান দিয়ে খানিক দূর এগোল রানা। যেমন আশা করেছিল, আইলের কাছাকাছি গাছগুলো আকারে ছোট। একটা গাছ তুলে প্লাস্টিকে মুড়ল, তারপর ভরে রাখল প্যাকে। ইতিমধ্যে কয়েক সারি গাছের ফটো তুলেছে ও।

পরবর্তী আধ ঘণ্টা ভিনিয়ার্ডের ভেতর হাঁটাহাঁটি করে ফসলের একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করল রানা। ফলগুলো এখনও পরিণত হয়নি, অথচ চলতি মাসের প্রথম দিকে যে চালানটা ধরা পড়েছে সেটা এই ফার্ম থেকেই পাঠানো হয়েছিল। এর মানে হলো, অন্তত একটা অংশের ফসল তোলা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রোপণ করা হয়ে থাকলে বছরে দু'তিনটে ফসল পাওয়া যেতে পারে। নাইলনের চাদর থাকায় বাড়তি টেমপারেচার পেয়েছে ফার্ম মালিকরা, আফিম চাষের মরশুম তিন মাস বাড়িয়ে নিতে পেরেছে।

আবার উবু হয়ে বসে হিসাব মেলাতে চেষ্টা করল রানা। প্রথম আফিম চারা দেখার পর বিশ সারি ধরে হাঁটাহাঁটি করেছে ও। প্রতিটি গাছ পরস্পরের কাছ থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে। প্রতিটি সারি দু'শো গজ লম্বা, অর্থাৎ প্রতি সারিতে চারাগাছ রয়েছে বারোশো। প্রতিটি সেকশনে কয়টা সারি ওর জানা নেই, তবে দুশো সারি নিরাপদ অনুমান বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। দুশো সারি মানে দুই লাখ চল্লিশ হাজার চারা। পরিণত হবার পর প্রতিটি গাছ থেকে যদি গড়ে পাঁচ গ্রাম আফিম পাওয়া যায়, সব মিলিয়ে

পাওয়া যাবে বারো লাখ গ্রাম আফিম। দশ গ্রাম আফিম থেকে এক গ্রাম মরফিন পাওয়া যায়। এভাবে হিসাব করলে একশো বিশ কিলো খাঁটি হেরোইন পাওয়া যাবে শুধু একটা সেকশনের চারাগাছ থেকেই। বেড়া কেটে ভেতরে ঢোকার আগে বারোটা সেকশন গুণেছে রানা। পাহাড়গুলোর ওপারে আরও সেকশন আছে, নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া চলে।

পরিমাণটা অবিশ্বাস্য। সতর্ক হিসেবেই এই ফার্ম থেকে দেড় হাজার কিলোগ্রাম নির্ভেজাল হেরোইন পাওয়া যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটা পুব উপকূলের সারা বছরের অবৈধ চাহিদা মেটানোর জন্যে যথেষ্ট। চলতি বাজার দর সঠিক জানা নেই, তবে আট থেকে দশ বিলিয়ন ডলারের কম হবে না। হায় খোদা, এ তো স্বপ্ন বা কল্পনাকেও হার মানাচ্ছে! শুধু এই একটা ফার্ম থেকে দেড় হাজার কিলোগ্রাম হাই গ্রেড হেরোইন বাজারে চলে যাবে। কোন রকমে একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে, তারপর প্রয়োজন হলে গোটা এলাকা ছেড়ে চলে যাবে মালিকরা।

ঢোক গিলল রানা। ছোট একটা প্রসেসিং ল্যাবরেটরির খোঁজে এসে কি ভয়ঙ্কর একটা অপারেশন-এর সন্ধান পেয়ে গেছে! এরকম ফার্ম দুনিয়ার আরও কয়েক জায়গায় থাকতে পারে, অন্তত না থাকাটাই অসম্ভব। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।

অকস্মাৎ ধাতব একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। উৎসের সন্ধানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। দীর্ঘ অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। চোখেও কিছু ধরা পড়ছে না। ভুল শুনেছে বোধহয়। পেশীতে ঢিল পড়ল। পরমুহূর্তে ঝুর ঝুরে নরম মাটিতে বুট ঘষার শব্দ ভেসে এল কানে। তারপর রানা দেখতে পেল। দু'সারি গাছের ওদিকে। অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি। একেবারে পাথর হয়ে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকাচ্ছেও না সরাসরি। সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছে

লোকটা।

গার্ড থামল রানার প্রায় উল্টোদিকে। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর আবার এগোল আইল-এর দিকে। ধীরে ধীরে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতে গাছগুলোর আরও গভীরে সরে আসছে, কোন আওয়াজ না করে। একবার সাইজমিক ডিটেকটর অ্যালার্ম মৃদু শব্দে বেজে উঠল, চওড়া একটা বৃত্ত তৈরি করে অনেকটা পথ ঘুরে এগোতে হলো ওকে। ইচ্ছে ছিল মেইন ইয়ার্ডের দিকে যাবে, স্পেকট্রো-ফটোমিটার ব্যবহার করে সার্চ করবে অ্যাসিটিক হাইড্রাইড-এর উৎস। পাপড়িবিহীন পপির চাষ হচ্ছে এখানে, এটা দেখার পর তার আর দরকার নেই। ক্যামেরায় বন্দী ছবি আর সংগ্রহ করা চারাই আইএনসিসি ও আয়ারল্যান্ড কাস্টমসকে তৎপর করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। এখন ওর কর্তব্য সংশ্লিষ্ট মহলকে খবরটা জানানো।

বেড়ার দিকে ফিরছে রানা, শুরু হলো বৃষ্টি। মাথার ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দেখতে না দেখতে পায়ের নিচে সমস্ত মাটি থকথকে কাদা হয়ে গেল। তবে বৃষ্টি আশীর্বাদও বটে ওর জন্যে, গার্ডরা ওকে সহজে দেখতে পাবে না।

আধ ঘণ্টা লাগল ভিনিয়ার্ডের শেষ মাথায় পৌঁছুতে। শেষ সারি ভাইন সরিয়ে সাবধানে সামনে তাকাল, বেড়ার কাছাকাছি কিছু নড়ে কিনা দেখে নিচ্ছে। মাথার হুড পিছনে ঠেলে দিল, কান পেতে আছে। বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কাটা বেড়া ওর ডান দিকে হবে, আন্দাজ করল। গাছগুলোর আড়ালে থেকেই সেদিকে এগোচ্ছে। এবড়োখেবড়ো জমিন, কিন্তু টর্চ জ্বালার ঝুঁকি নিতে পারছে না। দু'সারি গাছের মাঝখানে দু'তিনবার হোঁচট খেলো, তবে ভাগ্য ভাল যে আছাড় খায়নি একবারও। বৃষ্টি ও বাতাসে গাছের মাথা দোল খাচ্ছে, মাঝে

মধ্যেই ঝট করে মাথা সরিয়ে নিতে হলো। এরকম একবার মাথা সরিয়ে নেয়ার সময়ই ঘটনাটা ঘটল—রাইফেলটা ঠিক দেখতে পায়নি, অনুভব করতে পারল, বাঁটটা সবেগে নেমে গেল মাথার পাশ দিয়ে। গার্ডের অস্পষ্ট কাঠামো রাইফেলটা আবার তুলে আঘাত করতে গেল ওর মাথায়, কিন্তু এবার লোকটার মুখোমুখি রানা, তৈরি হয়ে আছে। হাত ও পা, দুটো একসঙ্গে ব্যবহার করল—রাইফেলের বাঁটটা হাত দিয়ে ধরে ফেলল, লাথিটা মারল লোকটার উরুসন্ধিতে। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে ছিটকে দূরে পড়ল গার্ড। কোন রকম চিৎকার করার সুযোগ দিল না, ছুটে এসে লাথি মারল মাথায় আর বুকে। কোন শব্দ না করে জ্ঞান হারাল লোকটা।

চারদিকে সাবধানে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা। কিছুই ঘটছে না। কোন চিৎকার নয়, পায়ের শব্দ নয়, কুকুরের ডাক নয়। লোকটা সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত ওর সামনে পড়ে গিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি কাটা বেড়া দিয়ে ভিনিয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল রানা। গার্ড জ্ঞান ফিরে পাবার আগেই যত দূর সম্ভব সরে যেতে হবে ওকে।

ছয়

ভোর হবার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তবে ঝিরঝির করে। গ্রাম্য একটা পথে রয়েছে রানা, লিমেরিক কাউন্টির অ্যাথেয়া-র উত্তরে। অ্যাথেয়া ছোট্ট একটা শহর, ফার্মটা

থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে।

ভিনিয়ার্ড থেকে বেরিয়েই স্যুট খুলে নিজের কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে রানা। স্যুটটা এখন প্যাকের ভেতর রয়েছে, ক্যামেরা আর হেলমেটের নিচে। ফিল্ম কার্ট্রিজগুলো রেখেছে জ্যাকেটের পকেটে, মনে পড়ে যাওয়ায় আশ্বস্ত হবার জন্যে হাত দিয়ে একবার ছুঁলো।

কাদায় থকথকে পথ দিয়ে হাঁটার সময় সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে রানা। এত সকালে শহরে ঢুকলে লোকজন সন্দেহের চোখে তাকাবে। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, সিন্ডিকেটের লোকজন সেজন্যেই ওর খোঁজে হেলিকপ্টার নিয়ে বেরুতে পারেনি। শহরটা ছোট্ট হলেও, এখানে তাদের চর থাকতে পারে।

ভিনিয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এদিকে না এসে উপায় ছিল না রানার। খোলামেলা পাহাড়ের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে গাড়িটার কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, অ্যাবিফিল গ্রামটা ওদিকেই, ফার্ম থেকে সবচেয়ে কাছের জনপদ–সিন্ডিকেটের লোকজন ওখানেই প্রথমে খুঁজবে ওকে। অ্যাথেয়ার দিকে আসার কারণ হলো, ম্যাপ বলছে এখানে টেলিফোন আর পোস্ট অফিস আছে। হাতে প্রমাণ থাকায় এখন আয়ারল্যান্ড কাস্টমসের সাহায্য চাইতে পারে ও। এখনও যদি কোন কারণে জ্যাক ফেরি মুখ ফিরিয়ে রাখে, ওর পক্ষে প্রাণ নিয়ে আয়ারল্যান্ড থেকে বেরুনো সম্ভব না-ও হতে পারে।

ফার্ন পাতায় ঢাকা চূড়া থেকে নিচে তাকাতেই ছোট্ট শহরটা দেখতে পেল রানা, একটা পাহাড়ের ভাঁজে ঝুলে আছে। ইঁট বিছানো একটাই সরু রাস্তা, দু'পাশে দু'তিনটে বাড়ি। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে নির্জন উপত্যকার ওপর দিয়ে চলে গেছে বহু দূর পর্যন্ত, তারপর হারিয়ে গেছে পাহাড়ের বাঁকে। কুয়াশার ভেতর কাছে-দূরে দু'একটা ফার্ম দেখা যাচ্ছে, তবে লোকজনের হাঁটাচলা এখনও

শুরু হয়নি। শহরটাও অচঞ্চল, কোথাও কোন রকম উত্তেজনার ভাব নেই। দুটো কার রয়েছে রাস্তার ওপর, ভাঙাচোরা অবস্থা দেখে অচল মনে হলো। দু'জন মাত্র লোককে হাঁটতে দেখল রানা, এক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আরেক বাড়িতে ঢুকল।

কয়েক মিনিট পর রাস্তাটায় নেমে এল রানা। অনুভব করল দু'পাশের জানালা দিয়ে কয়েক জোড়া চোখ লক্ষ করছে ওকে। আয়ারল্যান্ডের এ দিকটায় প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব, হাইকারদের আসা-যাওয়া নতুন কোন ঘটনা নয়। কাদামাখা কাপড়চোপড় ও রাকস্যাক দেখে ওকেও নিশ্চয়ই একজন হাইকার বলে মনে করছে ওরা।

রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় ডান পাশে একটা সরাইখানা, সেটার উল্টোদিকে পোস্ট-অফিস। ঝাপসা কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেল। কোথায় পোস্ট-অফিস, এ তো মুদি-দোকান! তারপর দোকানের পিছনে চোখ পড়ল–গ্রিল দিয়ে ঘেরা আলাদা একটা জায়গায় পোস্ট-অফিসের কাজ চলে। ভেতরে এক বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। সে পোস্টমিসট্রেসও বটে, আবার মুদি-দোকানটাও চালায়। কাউন্টারে রাকস্যাকটা রেখে এক প্রস্থ ব্রাউন পেপার আর খানিকটা মোটা সুতো কিনল রানা। ফিল্ম কার্ট্রিজ আর দুটো পপি ফল কাগজে মোড়ার আগে দ্রুত দু'লাইনের একটা নোট লিখল, সুতো জড়িয়ে বাঁধল ভাল করে, তারপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঠিকানা লিখল লন্ডনের নিজের ফ্ল্যাটের। আয়ারল্যান্ড কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে বাইরে থেকে খানিকটা চাপ দিলে ভোজবাজির মত কাজ হতে পারে। পার্সেল নিয়ে গ্রিলের সামনে চলে এল ও, পোস্টেজ-এর দাম মেটাল, দেখল ঢাকনিবিহীন পোস্ট-বক্সে পার্সেলটা ফেলে দিল বুড়ি। বক্সের গায়ে কালেকশন টাইমের একটা তালিকা সাঁটা রয়েছে, চোখ বোলাতে বোঝা গেল দুপুরের

আগেই পার্সেল রওনা হয়ে যাবে।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে পিছনের দেয়ালে টেলিফোনটা দেখতে পেল রানা, রাকস্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেদিকে এগোল। প্রথমে অ্যালডারশটে ফোন করল। যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে বেশ কয়েক মিনিট সময় নিল অপারেটর। পাঁচ-সাতবার রিঙ হতে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

'হ্যালো, স্বাতী?'

'কে?'

'ডোনা...? আমি রানা।'

'কে? মাসুদ রানা? ও, ভাই, তোমার গলা শুনে স্বস্তিবোধ করছি। আমি ইসাবেলা, মিসেস রিচমন্ড। কোত্থেকে বলছ, ভাই? ভাল আছ তো?'

'ইসাবেলা, আমি ভালই আছি। তোমরা সব ভাল তো?' বন্ধু-পত্নীকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'স্বাতী বা ডোনাকে ডেকে দিতে পারো?'

'আমরা সব ভাল– এক মিনিট, লাইনে থাকো, ভাই।'

অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা, ইসাবেলা ডোনার নাম ধরে ডাকছে। তারপর ক্লিক করে একটা শব্দ ভেসে এল, অন্য কোন কামরা থেকে এক্সটেনশন ফোনের রিসিভার তুলল ডোনা।

'মাসুদ ভাই? মাসুদ ভাই, সত্যি আপনি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কেমন আছ তোমরা?' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, টুলে বসে পুরানো খবরের কাগজ পড়ছে বুড়ি, এক হাতে ধূমায়িত কফির কাপ।

'মাসুদ ভাই, এদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে!' ডোনা সাংঘাতিক উত্তেজিত। 'আপনি কিছু শোনেননি?'

'না। কি ঘটেছে?'

'আমাদের নতুন ব্রাঞ্চ চীফ ফরহাদ ভাই এজেন্সির একজন

নাইট গার্ডকে ইন্টারোগেট করেন। তাঁর অনুরোধে আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মি. বাউচারও তাঁদের একজন নাইট গার্ডকে ইন্টারোগেট করেন। কারণটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে দু'জনেই নিজেদের কোন একটা অপরাধ স্বীকার করে। অপরাধটা করার জন্যে আন্ডারওয়ার্ল্ডের কেউ একজন ওদেরকে টাকা দিয়েছিল। লোকটার নাম নেকটার। নেকটারকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিস অ্যারেস্ট করেছে। তাকে জেরা করায় সে এমন একজনের নাম বলে, আপনি বিশ্বাস করবেন না!'

'কার নাম বলে?'

'কালাহানের, জিম কালাহানের!' ডোনার গলা উত্তেজনায় কাঁপছে। 'নামটা আগে কখনও শোনেননি?'

রানা চুপ করে আছে।

'জিম কালাহান আইএনসিসি-র চীফ ডীন র‍্যাদারফোর্ডের শোফার, মাসুদ ভাই,' বলল ডোনা, গলাটা কাঁপছে।

'তারপর?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদিকে, মি. র‍্যাদারফোর্ড তো নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন, জানেনই তো। কাল রাতে উনি নিজের হোটেলরুমে আত্মহত্যা করেছেন।'

'ওহ্ গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করল রানা।

'মাসুদ ভাই, কি থেকে কি ঘটছে, কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না। আমি আর স্বাতী আপনার কথা ভেবে খুবই দুশ্চিন্তায় আছি...'

'শোনো, ডোনা, উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু ঘটেনি। একা শুধু র‍্যাদারফোর্ড নন, এই হেরোইন কেসে আরও অনেক রুই-কাতলা জড়িয়ে আছে, একে একে তাদের পরিচয়ও প্রকাশ পাবে।'

'মাসুদ ভাই, আপনি জানতেন র‍্যাদারফোর্ড জড়িত?' ডোনা বিস্মিত।

পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। ঋজু কোপেনহেগেন থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, তথ্যটা এই প্রথম ডোনাকে জানাল। ঋজুর ফ্যাক্স রিপোর্ট পৌছুনোর কথা আইএনসিসি হেডকোয়ার্টার আর রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়। রানার গোপন নির্দেশ থাকায় ওর ফ্ল্যাটের মেশিনেও একটা কপি পাঠানোর কথা। কিন্তু দেখা গেল প্রথম দু'জায়গায় ঋজুর রিপোর্ট পৌছায়নি, পৌছেছে শুধু রানার ফ্ল্যাটের মেশিনে। কোথাও থেকে কেউ ফ্যাক্স পাঠালে সেটা অপরপ্রান্তের মেশিনে পৌছাচ্ছে কিনা তা সে সেই মুহূর্তেই জানতে পারবে। অপরপ্রান্তের মেশিন লক করা থাকলেই শুধু মেসেজ পৌছাবে না। কিন্তু লক করা ছিল না, থাকলে ঋজু বুঝতে পারত, আর বুঝতে পারলে রানার কাছে পাঠানো মেসেজে বিষয়টা উল্লেখ করত সে। তা করেনি। এর অর্থ হলো, বাকি দুই অফিসেও তার ফ্যাক্স পৌছেছে, কিন্তু সেগুলো কেউ সরিয়ে ফেলে। এটা ধরতে পেরে লন্ডন শাখার নতুন প্রধান ফরহাদকে গোপন নির্দেশ দিয়ে এসেছে রানা। সেই নির্দেশ অনুসারেই রানা এজেন্সির আর আইএনসিসি-র দু'জন নাইট গার্ডকে ইন্টারোগেট করা হয়। র‍্যাদারফোর্ড বুঝতে পারেন তিনি ধরা পড়ে যাবেন, আত্মহত্যা করার সেটাই কারণ।

রানা থামতে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ডোনা। জানতে চাইল, 'আপনি এখন কোথায়, মাসুদ ভাই? কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'আমি লিমেরিকের অ্যাথেয়া থেকে বলছি। যা খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি, ডোনা। ফ্ল্যাটের ঠিকানায় ফিল্ম আর নমুনা পাঠিয়ে দিয়েছি, কালকের মধ্যেই পৌছে যাবে। স্বাতী কোথায়, ডোনা?'

'কি বলছেন, মাসুদ ভাই! আপনি সত্যি...পেয়েছেন...? কিসের নমুনা? ওহ্ গড! আপনি...'

'থামো,' দ্রুত বাধা দিল রানা। 'ভুলে যেয়ো না খোলা লাইনে

কথা বলছ। স্বাতীকে একবার ডেকে দাও...'

'স্বাতী নেই, মাসুদ ভাই,' বলল ডোনা। 'কাল লন্ডনে চলে গেছে ও। ঠিক বলতে পারব না, সম্ভবত ফরহাদ ভাই ওকে ডেকে নিয়েছেন, কিংবা সে হয়তো চাকরিই ছেড়ে দিয়েছে। মাসুদ ভাই, আপনি অ্যালডারশট থেকে চলে যাবার পর আয়ারল্যান্ডের অনেক হোমরাচোমরা কর্তাব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি, আপনাকে ওঁরা যাতে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এমনকি বাবার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও ধরি। কিন্তু কি কারণে বলতে পারব না, কেউ ওরা অনুকূল সাড়া দেননি...'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল রানা। 'সে প্রসঙ্গ এখন থাক, ডোনা। আমি কি বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি চাই লন্ডন থেকে স্বাতী বা আর কাউকে তুমি ডেকে নাও। সে তোমাকে লন্ডনে নিয়ে যাবে। আমি চাই সরাসরি মি. বাউচারের সঙ্গে দেখা করবে তুমি। বলবে আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানায় ফিল্ম আর নমুনা পাঠিয়েছি। কিন্তু ওগুলো পাবার অপেক্ষায় থাকতে বারণ করবে। তাঁকে তুমি জ্যাক ফেরিকে ফোন করতে বলবে, তিনি যেন আয়ারল্যান্ড কাস্টমসকে ইমিডিয়েট ইনভেস্টিগেশনের জন্যে চাপ দেন।'

'কিন্তু মাসুদ ভাই, উনি কি আমার কথা শুনবেন?'

'আমার কথা বললে নিশ্চয়ই শুনবেন,' বলল রানা। 'শোনো, ডোনা, এর সঙ্গে রাজনীতি জড়িত—বহু রুই-কাতলা জালে আটকা পড়তে যাচ্ছে। র‍্যাদারফোর্ড আত্মহত্যা করেছেন, এ থেকে বুঝতে পারছ না?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ডোনা বলল, 'মাসুদ ভাই, আপনি সন্দেহ করছেন ভদ্রলোকের ওপর রাজনৈতিক চাপ থাকায়... কি যেন নাম? জ্যাক ফেরি...তার ওপর রাজনৈতিক চাপ আছে, তাই তিনি আপনাকে সাহায্য করতে ইতস্তত করছেন?'

'ঠিক তাই। তবে খোলা লাইনে এর বেশি কিছু বলতে পারছি

না। শোনো, এখন আমি ফেরিকে ফোন করব। তোমাকে যা বলেছি তুমি তাই করো, কাউকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে চলে যাও।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' ডোনার গলা একটু কেঁপে গেল। 'আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন, প্লীজ! লন্ডনে আপনার ফিরতে অনেক দেরি হবে নাকি? মনটাকে মানাতে পারছি না, আপনার জন্যে এত চিন্তা হচ্ছে...'

'কখন ফিরতে পারব এখনও বলতে পারছি না। কোন চিন্তা কোরো না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

কাউন্টারে ফিরে এসে বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাসল ও, বলল, 'এক কাপ কফি চাইলে পাব, প্লীজ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, বাছা!' সদয় হেসে বলল বুড়ি। 'এখুনি দিচ্ছি।'

কফির কাপ নিয়ে আবার ফোনের কাছে ফিরে এল রানা। এবার ফোন করল ডাবলিনে, আয়ারল্যান্ড কাস্টমস অফিসে। কানেকশন পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, চেহারায় অস্বস্তি। লাইনে এল জ্যাক ফেরির প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিজের পরিচয় দিয়ে ফেরিকে লাইন দিতে বলল রানা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে লাইনে থাকতে বলল মেয়েটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জ্যাক ফেরির গলা ভেসে এল। 'রানা! তুমি কোথায়, বন্ধু? আবার আয়ারল্যান্ডে ফিরে এসেছ নাকি?' কথার সুরে আন্তরিকতার অভাব নেই, তা সত্ত্বেও রানার কানে বেসুরো কি যেন একটা বাজল।

'হ্যালো, ফেরি। হ্যাঁ, আমি আয়ারল্যান্ডে।' বড় করে শ্বাস নিল রানা। 'ঢোকার পর আর বেরুইনি।'

'কি?'

'শোনো, তোমার পছন্দ হবে না এমন আরও একটা কথা বলি। তোমাকে যে ফার্মটার কথা বলেছিলাম, মনে আছে তো? ওখানে আমি গিয়েছিলাম। পেয়েও গেছি। কি পেয়েছি তা তুমি

জানো।'

'তুমি…কি?' চিৎকার করছে ফেরি। 'বাই গড, কোন্ অধিকারে তুমি…'

'থামো, থামো,' বাধা দিল রানা। 'অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ো, আগে কাজের কথা হোক। ফার্মটায় সত্যি পপির চাষ হচ্ছে, ফেরি–নিজের চোখে দেখে এলাম। শুধু দেখে আসিনি, চারাগাছের নমুনা, ফল, খেতের ছবি, সব নিয়ে এসেছি। প্রতিবার ফসল কেটে যে আফিম ওরা পাচ্ছে তা থেকে পনেরোশো কিলোগ্রাম হেরোইন তৈরি করছে ওরা।'

'পনেরোশো কিলো!' অবিশ্বাসে গলা বুজে এল ফেরির। 'এ তুমি আমাকে কিভাবে বিশ্বাস করতে বলো! নাহ্, অসম্ভব!'

'আমার কাছে ফটোগ্রাফিক প্রমাণ আছে। আরও আছে নমুনা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ফেরি জানতে চাইল, 'তুমি এখন কোথায়?'

'অ্যাঁথেয়া নামে ছোট্ট একটা শহরে, ফার্ম থেকে সাত-আট মাইল উত্তরে,' বলল রানা। 'একজন গার্ড আমার ওপর হামলা করেছিল, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। এর মানে হলো, ওরা জানবে রাতের বেলা কেউ একজন ওদের ভিনিয়ার্ডে ঢুকেছিল। দূরে বলে গাড়ির কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তাই উত্তর দিকে সরে এসেছি তোমাকে ফোন করার জন্যে–তোমাকে আর আইএনসিসি-র মি. বাউচারকে।' এক মুহূর্ত বিরতি নিল রানা। 'এ-ব্যাপারে সত্যি যদি কিছু করতে চাও, এই মুহূর্তে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তোমাকে। ফার্ম থেকে পাততাড়ি গোটাতে একদিনের বেশি লাগবে না ওদের।'

'তুমি এরইমধ্যে মি. বাউচারের সঙ্গে কথা বলেছ?' এক মুহূর্ত চুপ থাকার পর জানতে চাইল ফেরি।

'হ্যাঁ,' মিথ্যে বলল রানা। 'ফার্মে গিয়ে কি দেখেছি বললাম

তাঁকে। বলেছি, এখানে তিনি চলে এলেই প্রমাণগুলো দেখাতে পারব। ধরে নিতে পারো আজ দুপুরের মধ্যেই তিনি তোমাকে ফোন করবেন–সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে জরুরী তাগাদা দেবেন, তিরস্কার করবেন যদি সময় নষ্ট করো।'

'কে সময় নষ্ট করছে!' খেঁকিয়ে উঠল ফেরি। 'মি.বাউচারকে কি বলেছ তুমি?'

'ঠিক তোমাকে যা বলছি।'

'তাহলে প্রমাণগুলো এখনও কেউ দেখেনি?'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'না, এখনও দেখেনি। তবে ফিল্ম আর পপি ফল মি.বাউচারের ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়েছি। কালকের মধ্যে আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যাবে সব। তাছাড়া, তিনি তো আসছেনই, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। সে সুযোগ তুমিও নিতে পারো। কাছেই রয়েছ, কয়েকজন পুলিসকে নিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে চলে আসতে পারো।'

'পোস্ট করেছ? অ্যাথেয়া থেকে?'

'হ্যাঁ। দুপুরবেলা কালেকশন করা হবে। আশা করি কাল সকালে পৌঁছে যাবে লন্ডনে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ফেরি জানতে চাইল, 'ঠিক আছে। কি ঘটেছে আর কি দেখেছ সব আমাকে খুলে বলো।'

'তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ,' বলল রানা। 'কি ঘটেছে একবার তো বললামই। নিজের চোখে দেখতে চাইলে এখানে তোমাকে আসতে হবে। অন্তত পুলিস আর সেনাবাহিনীকে খবর দাও...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বাধা দিল ফেরি। 'বুঝতে পারছি, এখন আর বসে থাকা যায় না। শোনো, রানা, অ্যাথেয়া ছেড়ে

নড়ো না। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিস পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। ওরা তোমাকে অ্যাথেয়া থেকে তুলে নেবে, আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে ফার্মে। অ্যাথেয়ার কোথায় তুমি রয়েছ?'

'পোস্ট অফিসে।'

'ঠিক আছে, পুলিস না পৌঁছানো পর্যন্ত ওখানেই থাকো। অফিসে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, মি.বাউচার ফোন করলে ওরা যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়।'

'মন্দ নয়,' বলল রানা। 'তাহলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে।'

সরাইখানা থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে ন'টার সময় পোস্ট-অফিসে ফিরে এল রানা, দরজার পাশে কাঠের একটা চেয়ারে বসে কাস্টমস-এর পুলিস আসার অপেক্ষায় রয়েছে। ঠিক দশটার সময় দোরগোড়া থেকে ডাক দিল বুড়ি, 'কি বাছা, আরেক কাপ কফি চলবে?'

'জ্বী, ধন্যবাদ,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, রাকস্যাকটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখে দোকানের ভেতর ঢুকল। কফি তৈরি করে কাপটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল বুড়ি। এক কি দু'বার চুমুক দিয়েছে কাপে, ভারী একটা গাড়ির গিয়ার বদল করার আওয়াজ ঢুকল কানে। কাপটা হাতে নিয়েই খোলা জানালার সামনে চলে এল ও। গাঢ় সবুজ রঙের একটা বেডফোর্ড ভ্যান দোকানটার সামনে, মাঝ রাস্তায় দাঁড়াল, পিছন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল তিনজন পুলিস, প্রত্যেকের হাতে একটা করে শটগান। সবার পরনেই ইউনিফর্ম রয়েছে, কিন্তু কি যেন ঠিক মিলছে না। ঝট করে একটা প্রশ্ন জাগল মাথায়, ওকে তুলে নিতে এসে থাকলে ওদের হাতে শটগান থাকবে কেন? ব্রিটিশ পুলিসদের মত আইরিশ পুলিসদের হাতেও সাধারণত অস্ত্র থাকে না। তারপর রানা খেয়াল

করল, আইরিশ পুলিসের ভ্যান গভীর নীল হয়, গাঢ় সবুজ নয়। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা। ভ্যানের সাইড প্যানেল তাড়াহুড়ো করে নতুন রঙ করা হয়েছে—কোম্পানী বা ফার্মের নাম মোছার জন্যে।

জানালার সামনে থেকে পিছাতে শুরু করল রানা, লক্ষ করল পুলিসদের একজন হাত তুলে বাকি দু'জনকে ওর রাকস্যাকটা দেখাচ্ছে। ঘুরে ছুটল ও, বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছে। কাউন্টার ঘুরে এগিয়ে এল বুড়ি, চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়। তাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল, ঢাকনিবিহীন ডাকবাক্সে হাত ভরে ওর পার্সেলটা বের করল। বুড়ি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, সেদিকে কান না দিয়ে ছুটে পিছনের দরজায় চলে এল। দু'তিনটে লাথি মারতেই ভেঙে গেল সেটা, ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এসে ছোট্ট বাগান ধরে ছুটল, তারপর পাঁচিলের মাথায় উঠে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সরু একটা গলিতে।

গলিটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে হাফ-টনী একটা ট্রাক, ওটাকে ধরার জন্যে দৌড় দিল রানা। বাঁক ঘোরার সময় শ্লথ হলো ট্রাকের গতি, এই সুযোগে ওটার নাগাল পেয়ে গেল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পিছনে। ট্রাকের মেঝেতে একটা ক্যানভাস স্তূপ হয়ে আছে, সেটার তলায় গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকল চুপচাপ।

বাঁক নিয়ে আরেক সরু গলিতে ঢুকেছে ট্রাক, ক্যানভাসের ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখছে রানা ড্রাইভার কোন দিকে যায়। গলির শেষ মাথায় অ্যাথেয়ার মেইন রোড। আবার বাঁক ঘুরে পোস্ট-অফিসের দিকে যাচ্ছে ড্রাইভার। বাঁক ঘোরা সম্পূর্ণ হয়নি, ট্রাকের পিছন থেকে নেমে পড়ল রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝতে চাইছে কেউ ওকে দেখছে কিনা। তারপর ট্রাকের ফেলে আসা পথ ধরে পঞ্চাশ গজ হেঁটে ঢুকে পড়ল ছোট্ট একটা কাফেতে।

গোল মুখ, বয়েস হবে চল্লিশের কাছাকাছি, খদ্দের পেয়ে

গালভরা হাসি নিয়ে এগিয়ে এল এক মহিলা। 'গুড মর্নিং।'

'কফি,' বলে একটা চেয়ার নিয়ে সামনের জানালার কাছে চলে এল রানা। গলির সবটুকু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মেইন রোডের অংশবিশেষ। গলি বা মেইন রোডে কোন মানুষজনের হাঁটাচলা নেই। উত্তেজিত কোন চিৎকার-চেঁচামেচিও শোনা যাচ্ছে না। মহিলার হাত থেকে কফির কাপটা নেয়ার সময় খেয়াল করল হাতটা সামান্য কাঁপছে।

সবুজ ভ্যান আর শটগানধারী লোকগুলোর সঙ্গে আইরিশ পুলিস ডিপার্টমেন্টের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা সিন্ডিকেটের লোক। কোত্থেকে এল, কিভাবে জানল ওকে কোথায় পাওয়া যাবে, এ-সব নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার সময় এটা নয়। শহরটা এত ছোট, ওরা যদি প্রতিটি বিল্ডিং সার্চ করতে শুরু করে, ওকে খুঁজে পেতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। গোটা শহর খোলা মাঠ দিয়ে ঘেরা, মাঠগুলোর শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে উঁচু-নিচু পাহাড় শ্রেণী। যেদিকেই ছুটুক ও, আধ মাইল পেরোবার আগেই ধরা পড়ে যাবে। অথচ এই শহরে ওর থাকাও চলবে না।

কাফের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। দেয়ালে একটা ফোন আছে, কিন্তু সেটায় ডায়াল নেই। জানা কথা, শহরে ডাইরেক্ট ডায়ালিং সিস্টেম এখনও চালু হয়নি। প্রতিটি কল সেন্ট্রাল সুইচবোর্ডের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এর মানে হলো ওকে চোখের আড়ালে হারিয়ে ফেলার পর ভুয়া পুলিসদের প্রথম কাজ হবে সুইচবোর্ডকে নির্দেশ দেয়া–অ্যাথেয়া থেকে বাইরে কোন কল গেলে তা পিন-পয়েন্ট করা।

সময় বয়ে চলেছে। এখানে বসে থাকাটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ওর খোঁজে চলে আসতে পারে সিন্ডিকেটের লোকগুলো। রানা সিদ্ধান্ত নিল, মাঠ পেরিয়ে পাহাড়েই উঠবে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে, এই সময় একটা মোটরসাইকেল এসে

থামল কাফের সামনে।

এক মিনিট পর তরুণ রাইডার কাফের ভেতর ঢুকল, মাথা থেকে হেলমেট আর হাত থেকে দস্তানা খুলছে। কাফের পিছন থেকে বিশ-একুশ বছরের একটা মেয়ে বেরিয়ে এল, পরস্পরকে দেখে হাসল তারা, তারপর নিচু গলায় গল্প জুড়ে দিল।

পকেটে কিছু খুচরো পয়সা আছে, কয়েকটা কাউন্টারে রেখে কাফে থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। মোটরসাইকেলটার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে বারবার, যেন কোন দিকে যাবে স্থির করতে পারছে না। মেইন রোডের কাছাকাছি এক প্রৌঢ় লোক ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এদিক ওদিক ঘন ঘন তাকালেও, রানার দৃষ্টি বারবার মোটরসাইকেলের ওপর ফিরে আসছে। তিনশো পঞ্চাশ সিসি কাওয়াসাকি। মেঠো পথে চালাতে কোন সমস্যা হয় না। রাইডার সম্ভবত এলাকারই ছেলে, ইগনিশনে চাবি রেখেই কাফেতে ঢুকেছে, জানে এখান থেকে তার বাহন কেউ চুরি করবে না।

কাওয়াসাকিতে উঠে বসে স্টার্ট দিতে যাবে রানা, মেইন রোডের মুখে দাঁড়ানো লোকটা চিৎকার জুড়ে দিল। ঝট করে সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, লোকটা দৌড়ে এদিকেই আসছে। 'চোর! চোর! সিমন, তোমার মোটরসাইকেল নিয়ে গেল...'

স্টার্ট দিয়ে বাইক ছেড়ে দিল রানা। ওর পিছনে কাফের দরজা খুলে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল তরুণ রাইডার, রাগে চিৎকার করছে আর শূন্যে ঘুসি মারছে। পিছন ফিরে তাকাতে রানা দেখতে পেল মেইন রোডের মাথায় ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস এসে দাঁড়িয়েছে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে শটগান তুলে গুলি করল সে। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল প্রথম বুলেট। দ্বিতীয় বুলেটের আওয়াজ শুনল

রানা, তবে ইতিমধ্যে বাঁক ঘুরে আরেক গলিতে ঢুকে পড়েছে ও।

গলির শেষ মাথায় মাঠ, তারপর পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে আঁকাবাঁকা সরু পথ। চূড়ায় উঠে এসে থামল রানা, পিছন ফিরে ফেলে আসা শহরটার দিকে তাকাল। কেউ ওকে ধাওয়া করেনি, দূর থেকে শহরের সবটুকু রাস্তা পরিষ্কার দেখাও যাচ্ছে না। সামনে তাকিয়ে পাকা একটা রাস্তা দেখল, ডান দিকে চলে গেছে। আগেই দেখা আছে ম্যাপ, কাজেই জানে এই রাস্তা ধরে উত্তরের ক্যারিকেরী শহরে পৌঁছানো যাবে, মাইল ছয়েক দূরে। আরও চার মাইল পেরুলে পাওয়া যাবে আরডাপ গ্রাম, তারপর পড়বে টি-টোয়েনটিএইট জাংশন। তবে খুব ভাল করেই জানে ও, ক্যারিকেরী পৌঁছুনোর আগেই রাস্তা থেকে সরে যেতে হবে ওকে, তা না হলে নির্ঘাত ধরা পড়তে হবে।

এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। মোটরসাইকেলের গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে বাতাসের তীব্র শোঁ-শোঁ আওয়াজ। মাইল দুয়েক এগোবার পর পিছনে তাকিয়ে সবুজ ভ্যানটাকে দেখতে পেল রানা, এখনও এক জোড়া পাহাড়ের পিছনে রয়েছে–ব্যবধান মাইল দুয়েক। ছোট একটা চূড়ায় ওঠার সময় রাস্তাটা সরু হয়ে গেছে। খানিক সামনে দেখা গেল রাস্তার ওপর রাজ্যের নুড়ি পাথর ছড়ানো। ওগুলো এনে রাখা হয়েছে ভাঙা রাস্তা মেরামত করার জন্যে, কিন্তু ঠিকাদাররা এখনও কাজ শুরু করেনি। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে ছোটার সময় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার অবস্থা হলো রানার। রাস্তার দু'পাশে পাঁচিল, পাঁচিলের ওপারে ঝোপ ঝাড় ভর্তি ঢাল, ঢালের নিচে পচা কাদা ভরা পুকুর আর ডোবা। পাঁচিল কোথাও কোথাও ভাঙা হলেও, রাস্তা ছেড়ে ঢাল ধরে পালাবার কোন উপায় নেই।

প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেতে খেতে কয়েক মিনিট এগোবার পর ছোট একটা খাল দেখতে পেল রানা, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে

এগিয়েছে। ব্রিজটা হঠাৎ উদয় হলো, খালের ওপর দিয়ে চলে গেছে। ব্রিজের ওপারে গিরিপথ। দু'পাশে পাহাড়, মাঝখানে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা। ব্রিজটা পেরিয়ে এল রানা, এতক্ষণে দেখতে পেল সরু একটা মেঠো পথ। পথটা রাস্তার দু'দিকে চলে গেছে—একটা উত্তর-পশ্চিম দিকে, দ্বিতীয়টা দক্ষিণ-পুব দিকে।

ব্রেক কষে থামল রানা, সাবধানে মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে আসছে ব্রিজের দিকে। হঠাৎ বাঁক ঘুরে দক্ষিণ-পুব দিকের পথে নামল, কিছুদূর এগিয়ে পথেও থাকল না, মাঠের ওপর ছোট্ট একটা বৃত্ত তৈরি করে ফিরে এল ব্রিজে।

কাওয়াসাকি থামিয়ে সীট থেকে নামল রানা। বাহনটা অসম্ভব ভারী, দু'হাত দিয়ে ধরে শূন্যে তোলার সময় হাঁপিয়ে উঠল। ব্রিজের কিনারায় বা ব্রিজের পাশের ঢালে চাকার দাগ রাখতে চায় না ও। ঢাল বেয়ে নামার সময় মোটরসাইকেল ধরা হাত দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। গাছপালার আড়াল থেকে ব্রিজটা যখন দেখা যাচ্ছে না, সাবধানে ঘাসের ওপর বোঝাটা নামাল। ঘাসগুলো লম্বা, মোটরসাইকেল ঠেলে খালের কিনারায় চলে এল ও। সরাসরি ব্রিজের নিচে উবু হয়ে বসে থাকল, পাশেই কাত হয়ে পড়ে থাকল কাওয়াসাকি।

খানিক পরই এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ ভেসে এল। ব্রিজ পেরিয়ে চলে গেল ভ্যানটা। এক সময় দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, নিশ্চিত হয়ে নিল ভ্যানটাকে অনুসরণ করে অন্য কোন গাড়ি আসছে না। তারপর খালের কিনারা ধরে মোটরসাইকেল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল উজানের দিকে। খানিক দূর আসার পর সমতল একটা মাঠ পাওয়া গেল, কাওয়াসাকিতে উঠে বসে স্টার্ট দিল রানা। বেশি দূর এগোল না, রাস্তা থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে থামল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ওকে।

এক সময় দেখতে পেল ভ্যানটা ব্রিজের দিকে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

ব্রিজে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যান। শটগানধারী চারজন লোক নামল নিচে। দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে মেঠো পথ ধরে ছুটল তারা, খানিক দূর দেখে এসে আবার ফিরে এল ভ্যানের কাছে। একজন লোক হাত তুলে দক্ষিণ-পুব দিকের পথটা দেখাল। তার দেখাদেখি বাকি সবাই আবার চড়ল ভ্যানে। ড্রাইভার পিছিয়ে এল খানিকটা, তারপর ব্রিজ থেকে নেমে দক্ষিণ-পুব দিকের পথ ধরে ছুটল। যতক্ষণ দেখা গেল ভ্যানটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এক সময় পাহাড়ের একটা চূড়ার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ব্রিজে উঠে আসছে রানা। পশ্চিম দিকে রওনা হবে।

রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরার পরপরই আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পথের অবস্থা খুবই করুণ। শুধু যে খানা-খন্দে ভরা তা নয়, মাটির তলায় ছোট-বড় অনেক পাথরও লুকিয়ে আছে, ঘাসে মোড়া থাকায় চেনা দুষ্কর। এরকম লুকিয়ে থাকা পাথরে লেগে মোটরসাইকেলের চাকা শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে কয়েকবার, তিন বার সীট থেকে ছিটকে পড়েছে রানা। ভাগ্য নেহাতই ভাল যে এখনও মারাত্মক ধরনের কোন চোট পায়নি, বাহনটাও অচল হয়ে পড়েনি।

নির্দিষ্ট কোন প্ল্যান নেই রানার। আপাতত শুধু অ্যাথেয়া থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়াই উদ্দেশ্য। নির্জন পাহাড়ী এলাকা আর কুয়াশা ঢাকা উপত্যকাই ওকে এখন নিরাপত্তা দিতে পারে। ওর ভাড়া করা গাড়িটার কাছে ফিরে যেতে পারলে মন্দ হত না, কিন্তু সে সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। জ্যাক ফেরিকে এখনও পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে বাধছে ওর। পুলিস নিয়ে সিন্ডিকেটের

ফার্মে পৌঁছাতে তার হয়তো দেরি হচ্ছে। ভুয়া পুলিসগুলো সবুজ ভ্যান নিয়ে ওকে ধরতে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তাদেরকে ফেরিই পাঠিয়েছিল এমন না-ও হতে পারে।

স্টালী-র উত্তরে একটা গলফ কোর্স-এর কিনারায় পৌঁছুল রানা। জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে মেইন রোডের দিকে তাকিয়ে আছে। আর এক ঘণ্টা পর রাত নামবে, তারই অপেক্ষায় আছে ও। এখান থেকে টি-টোয়েনটিএইট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সোজা শহরে ঢুকেছে। যানবাহন আছে, তবে খুবই কম, সেগুলোর মধ্যে পুলিস কার 'গোস্ট ভ্যালী ভিনিয়ার্ড' লেখা সবুজ ভ্যান একটাও নেই।

সাড়ে ন'টার দিকে আবার রওনা হবার জন্যে তৈরি হলো রানা। ইতিমধ্যে চারদিকে জাঁকিয়ে বসেছে অন্ধকার।

শহরে ঢোকার সময় কোন সমস্যা হলো না। তবে ভেতরে ঢোকার পর নিজেকে অরক্ষিত মনে হলো। কাওয়াসাকির পেট্রল প্রায় শেষ, শহরে না ঢুকে কোন উপায়ও ছিল না। ওর ওয়ালেট রাকস্যাকে রয়ে গেছে, আর রাকস্যাকটাকে শেষবার দেখছে ত্রিশ মাইল উত্তরে অ্যাথেয়ার পোস্ট-অফিসের সামনের বারান্দায়, চেয়ারে হাতলের সঙ্গে ঝুলছে। পকেটে এই মুহূর্তে খুচরো একশো সেন্ট আছে। একশো সেন্টে খুব সামান্যই পেট্রল কেনা যাবে, তারপর আর খাবার কেনার জন্যে কিছু থাকবে না। অথচ খিদেতে অসুস্থ বোধ করছে ও। একশো সেন্টে খুব বেশি হলে চকলেটের কয়েকটা বার পাওয়া যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

অ্যাভিনিউটা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে, মূল শহরকে ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগোবার পর আবাসিক এলাকা পড়ল, তারপর শিল্পাঞ্চল, সবশেষে আবার দোকান-পাট। দশটা বাজে। পেট্রল শেষ হয়ে এসেছে। এক সারি দোকান দেখল রানা, ওগুলোর পাশে ছোট

একটা কার পার্ক। রাস্তার কিনারায় মোটরসাইকেল থামাল।

রাস্তার দু'দিকই খালি পড়ে আছে, দোকান-পাটও সব বন্ধ। আশপাশে অল্প কয়েকটা বাড়ি, জানালগুলোয় পর্দা ঝুলছে। মোটরসাইকেল ঠেলে কার পার্কে উঠে এল রানা। বাহন এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে পার্কিং এরিয়ার বেড়ার কাছে চলে এল, এক মিনিট খোঁজাখুঁজি করতেই পানির খালি একটা পরিষ্কার বোতল পেয়ে গেল। গভীর ছায়ায় পার্ক করা একটা ভিভাকে বেছে নিল ও। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, চলে এল পেট্রল ট্যাংকের কাছে। পেননাইফ দিয়ে ট্যাংকে একটা ফুটো তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগল না। প্লাস্টিকের বোতলটা ভরে নিল রানা। কাওয়াসাকির ট্যাংক ভরাট করতে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হলো ওকে। কাজটা শেষ হতে পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে ভিভার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা লিখে রাখল, সুযোগ আর সময় মত মালিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ক্ষতিপূরণ করা যাবে।

নির্জন রাস্তায় ফিরে এল রানা। পরবর্তী ক্রসরোডে পৌঁছে বাঁক নিল দক্ষিণ দিকে। এক সময় একটা রাউন্ডঅ্যাবাউটে পৌঁছুল, এখানে একটা সাইন টি-টেয়েনটিএইট নির্দেশ করছে। সামনে একটা পিলার-বক্স দেখতে পেল রানা, রাস্তা পেরিয়ে সেটার পাশে থামাল কাওয়াসাকি, ভেজা পার্সেলটা ঢুকিয়ে দিল বক্সে। কয়েক মিনিট পর পুব দিকে রওনা হলো ও, টি-টোয়েনটিএইট ধরে ট্রালী থেকে বেরিয়ে এল, একশো সেন্ট দিয়ে কেনা চকলেটের বার চিবাচ্ছে।

সাত

ঘুমের মধ্যে খড়ের আরও ভেতরে মুখ গুঁজে দিল রানা, নাকে ধুলো ঢোকায় হাঁচি দিল, ফলে ঘুমটা ভেঙে গেল। উঠে বসল ও, পুরানো ও পরিত্যক্ত গোলাঘরের চারদিকে তাকিয়ে আবছা অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে মনে পড়ল এখানে কিভাবে এসেছে। রাত বারোটার দিকে শরীরটা একেবারে বেঁকে বসে। দুই রাত বিশ্রাম নেয়া হয়নি, পেটেও তেমন কিছু পড়েনি, তার ওপর বেশিরভাগ সময়ই বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে হয়েছে। হঠাৎ অন্ধকার আকাশের গায়ে গোলাঘরটাকে সামনে ঝুলতে দেখে মনে হয়েছিল বিধাতা ওর ওপর সদয় হয়েছেন।

শরীরে শক্তি নেই, তবু জোর করে খড়ের ওপর দাঁড়াল রানা, টলতে টলতে দরজার সামনে এসে কপাটটা সামান্য একটু ফাঁক করল। বিখ্যাত- এমারেল্ড পাহাড় কেরীর ঢালে গোলাঘরটা। ঘণ্টাখানেক হলো দিনের আলো ফুটেছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, ঢালের চারপাশে কোথাও কেউ নেই। নিচের রাস্তায় মাঝে-মধ্যে দু'একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। আরও সামনে এক সারি পাহাড়, কাউন্টি কেরী ইনল্যান্ড আর বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের ক্যাসলমেইন হারবারকে আলাদা করে রেখেছে।

খড়ের ওপর ফিরে এসে চিন্তা করছে রানা। বৃষ্টির কারণেই সিন্ডিকেটের লোকেরা হেলিকপ্টার নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরুতে পারেনি। তবে আশপাশের ছোট-বড় সব শহরেই যে ওরা লোক

পাঠিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শহর থেকে দূরে থাকা রানার জন্যে কঠিন হবে না, কারণ গোটা পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে মাইলের পর মাইল শুধু নির্জন পাহাড় সারিই দেখতে পাওয়া যাবে, লুকিয়ে থাকার জন্যে আদর্শ জায়গা। প্রাচীন প্রাচীর, পরিত্যক্ত ফার্ম ইত্যাদিও পাওয়া যাবে। অস্থির বোধ করছে রানা, একমাত্র জানালাটার সামনে এসে বাইরে তাকাল আবার। বৃষ্টি কমার কোন লক্ষণ নেই।

ভিজতে আর রাজি নয় রানা, ভিজলে নির্ঘাত নিউমোনিয়ায় ধরবে। হঠাৎ নিচের রাস্তা ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল। একসঙ্গে কয়েকটা গাড়ি দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এসেছে। রাস্তাটা দীর্ঘ একটা ঢাল বেয়ে নেমে গেছে কিলারনী-র দিকে। ক্যানভাস ঢাকা দুটো ট্রাক দেখল রানা, মন্থরগতি একটা লরি-ট্রেইলর কমবিনেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লরি-ট্রেইলর হেলেদুলে পাহাড়ের মাথায় উঠল, তারপর নামতে শুরু করল অপর দিকে, ক্রমশ স্পীড বাড়ছে। ট্রেইলরটা গাঢ় সবুজ রঙ করা, গায়ে হলুদ হরফে লেখা–'গোস্ট ভ্যালী ভিনিয়ার্ড'।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে রানা। জ্যাক ফেরির ভূমিকা যা-ই হোক, আয়ারল্যান্ড কাস্টমস আর পুলিসের ওপর আইএনসিসি-র জরুরী তাগাদাতেও কোন কাজ হচ্ছে না? লন্ডনে বসে উলরিখ বাউচারই বা কি করছেন? ডোনার মাধ্যমে চব্বিশ ঘণ্টা আগে তাকে সব কথা জানিয়েছে ও।

লরি-ট্রেইলর যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এখনও সেদিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে রানা। চোখের কোণে কিছু একটা নড়তে দেখে কাছাকাছি রাস্তায় দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। কি সাংঘাতিক! আরেকটা সবুজ ট্রাক, পিছনে ট্রেইলর। এটারও গায়ে লেখা রয়েছে 'গোস্ট ভ্যালী ভিনিয়ার্ড'। হেলেদুলে ঢালু রাস্তা বেয়ে পাহাড়-চূড়ায় উঠে যাচ্ছে।

ঘুরল রানা, ছুটে চলে এল গোলাঘরের এক কোণে। কাওয়াসাকিতে বসে স্টার্ট দিল ও, যেন ওর মেজাজ বুঝতে পেরে চাপা আক্রোশে গর্জে উঠল এঞ্জিনটা।

প্রথম লরি-ট্রেইলর কমবিনেশন নাগালের বাইরে চলে গেছে, তবে মাইল তিনেক মোটরসাইকেল ছোটাবার পর দ্বিতীয়টাকে সামনে দেখতে পেল রানা। রাস্তাটা আঁকাবাঁকা, উঁচু ঢিবি এড়াবার জন্যে কোথাও কোথাও দীর্ঘ ঘুরপথ ধরে এগিয়েছে। রাস্তা থেকে ঢালে নেমে এল রানা। গাছপালা গায়ে গায়ে লেগে আছে, ঝোপ-ঝাড় এত ঘন যে নিচের মাটি দেখা যায় না। এরকম ঢালে মোটরসাইকেল চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। ট্রাকের সামনে পৌছানোর জন্যে স্পীড কমাতেও ইচ্ছে করছে না। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে কাওয়াসাকি। এখন যদি উল্টে যায় বাইক, কিংবা রানা যদি কোন গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়, জখমটা হবে মারাত্মক, মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

বিশাল এক অর্ধবৃত্ত তৈরি করে সামনের রাস্তায় উঠে এল রানা, কাওয়াসাকিটাকে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছে। ও নিজেও এই মুহূর্তে রাস্তার কিনারায় একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তাটা এখানে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়চূড়ায়। এক সময় ট্রাকটাকে দেখতে পেল ও, পিছনে ভারী ট্রেইলর নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে রাস্তা ধরে উঠে আসছে। গাছটার পাশে বসে পড়ল রানা, ঝোপের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। ট্রাক ক্যাব-এর ভেতর সীটে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে ড্রাইভার। লোকটা নিগ্রো। আমেরিকান নাকি? ক্যাব-এ আর কেউ নেই। ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকের পিছনে বা ট্রেইলরের মাথায়ও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ট্রাকটার ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল রানা। পিছু পিছু কোন কারও আসছে না। ট্রেইলরের ছাদেও কেউ নেই।

ড্রাইভার ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে

ছুটল রানা। ছুটতে ছুটতে লাফ দিল, উঠে পড়ল রানিং বোর্ডে। হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে গেল ক্যাব-এর দরজা। ভেতরে ঢুকে সরু ও লম্বা একটা ছুরি ধরল ড্রাইভারের গলায়, খোলা দরজার বাইরে ঝুলে আছে পা দুটো। 'ট্রাক থামলেই গলা কাটব,' হিসহিস করে বলল রানা।

নিগ্রোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। সে শুধু নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

পাহাড়-চূড়ায় উঠে এল ট্রাক। 'বাম দিকের মেঠো পথ ধরো,' নির্দেশ দিল রানা।

বাঁক ঘোরার সময় গর্জে উঠল এঞ্জিন। রাস্তা ছেড়ে পিচ্ছিল কাদায় পড়ল ট্রাক। রানা বলল, 'সাবধানে চালাও, দেখেশুনে–কাদায় চাকা আটকে গেলে তুমি খুন হয়ে যাবে।'

মাইল দুয়েক এগোবার পর পথের পাশে একটা গোলাঘর দেখা গেল। দরজায় কবাট নেই, ছাদটাও ভাঙা। 'ওটার সামনে থামবে, তবে পথের দিকে মুখ করে,' নির্দেশ দিল রানা, এখন পর্যন্ত আশপাশে কোন লোকজন দেখেনি।

ছুরির ফলা সামান্য একটু ঘষা খাওয়ায় ড্রাইভারের গলা থেকে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা গড়িয়ে নেমে আসছে। সম্ভবত উত্তেজনায় বা ভয়ে এখনও সে কোন ব্যথা অনুভব করছে না। বৃষ্টি ভেজা বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, তারপরও দরদর করে ঘামছে লোকটা।

পরিত্যক্ত গোলাঘরের দিকে পিছন ফিরে ট্রাক দাঁড় করাল সে। রানার নির্দেশে শান্তভাবে নিচে নামল, পিছন ফিরল, সার্চ করতে কোন বাধা দিল না। লোকটার সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, দেখে নিয়ে কিডনিতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা, একই সঙ্গে মুঠোয় চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। লোকটার গলা পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, সেখানে আবার ছুরির ফলা ঠেকাল ও। 'কোথায় যাচ্ছিলে?' লোকটার ড্রাইভিং লাইসেন্স আর মানিব্যাগ

নিজের পকেটে ভরে নিয়েছে আগেই।

ঢোক গিলে কথা বলার চেষ্টা করল ড্রাইভার, দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ বেরুল শুধু। ছুরির ফলা সামান্য সরিয়ে এনে প্রশ্নটা আবার করল রানা।

'পশ্চিমে...কর্কে।'

'কর্কের কোথায়?'

'বিয়াল্লিশ নম্বর জেটিতে...জাহাজ বা বোট আছে ওখানে...ক্লেমেঙ্গোর সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছে।'

'কে বলে দিয়েছে?'

'ফার্মের লোকজন।'

রানা জানতে চাইল, 'ট্রাকের পিছনে আর ট্রেইলরের ভেতর কি আছে?'

মাথা নাড়ল ড্রাইভার। 'আমাকে বলেনি।' তবে ছুরিটা আবার গলায় ঠেকতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'ওয়াইন...স্রেফ ওয়াইন। ইচ্ছে হলে নিয়ে যান...'

'শুধুই ওয়াইন?' হেসে উঠল রানা। 'হেরোইন নয়?'

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ড্রাইভার, গলায় আবার ছুরির ফলাটা ঠেকতে ওটার কথা মনে পড়ল, গলা শুকিয়ে যাওয়ায় ঢোক গিলতে কষ্ট হলো।

'ট্রাকে তাহলে শুধু ওয়াইন নয়, হেরোইনও রয়েছে, কি বলো? ক্লেমেঙ্গোকে ট্রাকটা ডেলিভারি দেয়ার পর এই হেরোইন কোথায় যাবে?'

'যীশু আর মেরির কিরে, হেরোইনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ড্রাইভার।

'মিথ্যে বলে পার পাবে না,' বলল রানা। 'তুমি আইরিশ নও, হয় আমেরিকান নয়তো কানাডিয়ান। কার্গোর বিশেষ গুরুত্ব না থাকলে বাইরে থেকে ড্রাইভার আমদানি করার কোন কারণ

থাকতে পারে না। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, এই হেরোইন কোথায় পাঠানো হবে?'

গলায় ছুরি থাকায় সাবধানে মাথা নাড়ল ড্রাইভার। 'ঈশ্বর আমাকে বাঁচাও! বিশ্বাস করুন, আমার কাজ ক্লেমেঞ্জোর কাছে ট্রাকটা পৌঁছে দেয়া। বাকি যা করার সে-ই করবে। আমি এমন কি এ-ও জানি না যে ট্রাকের বা ট্রেইলরের কোথাও ওই জিনিস লুকানো আছে। কতটুকু, তাও আমাকে বলা হয়নি।'

লোকটার কথা বিশ্বাস করছে রানা। 'পুলিস রেইড সম্পর্কে বলো।'

আবার চোখ বড় বড় করল লোকটা। 'পুলিস রেইড? কোথায়? ফার্মে? না তো!'

লোকটাকে গোলাঘরের ভেতর নিয়ে এসে এক ঘুসিতে অজ্ঞান করল রানা। খানিক খোঁজাখুঁজি করতে কয়েক প্রস্থ রশি পাওয়া গেল, সেগুলো দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল মেঝেতে। বাইরে বেরিয়ে এসে ট্রাক ও ট্রেইলরটা পরীক্ষা করল। ট্রেইলরের পিছনে দরজা, তাতে বিরাট একজোড়া তালা ঝুলছে। তালা ছাড়াও ইস্পাতের গোল একটা চাকতির মাঝখানে লম্বাটে ফুটো দেখা যাচ্ছে, দেখেই বোঝা যায় ওটা কী হোল। তালা ভাঙলেই হবে না, দরজা খুলতে হলে চাবিও দরকার।

গোলাঘরে ফিরে এসে লোকটাকে আবার সার্চ করল রানা। কিন্তু চাবি নেই। আবার বাইরে বেরিয়ে এসে ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকের পিছনটা পরীক্ষা করল। বড় আকৃতির টিনের বাক্স রয়েছে অনেকগুলো, সব মিলিয়ে পঞ্চাশটা। টুলবক্স থেকে রেঞ্চ এনে একটা বাক্সের তালা ভাঙল। ভেতরে পলিথিনে মোড়া কালচে-খয়েরি রঙের আফিম রয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটের ওজন পাঁচ কেজির কম হবে না। বাক্সটায় আছে দশটা প্যাকেট। পঞ্চাশটা

বাক্সে তাহলে আড়াই হাজার কেজি আফিম আছে।

এই আফিম থেকে ফার্মেই মরফিন, তারপর মরফিন থেকে হেরোইন তৈরি করার কথা; কিন্তু সাবধানের মার নেই ভেবে আগেই তৈরি করা হেরোইনের সঙ্গে আফিমও সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল সিন্ডিকেটের লোকেরা।

ট্রাকের পিছন থেকে ক্যাব-এর মাথায় উঠে এল রানা। টিনের দুটো বালতি, অতিরিক্ত একজোড়া টায়ার, খালি জেরি ক্যান আর একটা রেঞ্চ পড়ে থাকতে দেখল। লাল রঙ করা একটা ড্রামও আছে, কাত করা। ড্রামটার দুই প্রান্তের কোন দিকই কাটা হয়নি। তবে গায়ে, মাঝামাঝি জায়গায়, খুদে একটা দরজা তৈরি করা হয়েছে, তাতে ছোট একটা তালাও ঝুলছে। রেঞ্চ দিয়ে চাড় দিতে কজা সহ তালাটা খুলে এল। ভেতরে হাত গলিয়ে একটা জ্যাক, বিভিন্ন আকৃতির রেঞ্চ আর ব্যাটারিচালিত একটা করাত বের করল রানা। ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিল আবার, তারপর নেমে এসে বসল ট্রাকের ক্যাবে। গ্লাভ বক্স আর সীট পকেট হাতড়ে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের একটা ম্যাপ পেল। সেটা পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, ওর সামনে তিনটে রাস্তা খোলা আছে। পশ্চিমে ট্রালীর দিকে যাওয়া যায়, দক্ষিণে কিলনারী আর বান্ট্রীম বে, পুবে কর্ক। যেদিকেই যাক, মেইন রোড় ধরে যেতে হবে ওকে। অথচ ট্রাক নিয়ে মেইন রোডে থাকা সমূহ বিপদ।

কর্ক-এর দিকে যাবার সেকেন্ডারি রোডগুলো পরীক্ষা করল রানা। ট্রাক আর ট্রেইলরে যখন আফিম আর হেরোইন আছে, পথে নিশ্চয়ই কোথাও চেক পয়েন্টও থাকবে, কাজেই চুরি করা ট্রাক নিয়ে ও যে পশ্চিমে ট্রালী বা দক্ষিণে বান্ট্রী বে-র দিকে যাবে না এটা বুঝতে খুব বেশি সময় নেবে না সিন্ডিকেটের লোকেরা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ওদের লোকজন সিক্সটিন-টি-টোয়েনটি এইট বরাবর সার্চ শুরু করবে। তবে জালের মত বিছানো সেকেন্ডারি

রোড ধরে এগোলে ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। কর্ক অনেক দূর, অত দূরে হয়তো পৌঁছানো যাবে না; তবে হাজারখানেক লোকের বাস এমন ছোটখাট শহর পথের পাশে অবশ্যই পড়বে দু'একটা, সেখানে পাঁচ-সাতজন পুলিসও থাকার কথা। টি-টোয়েনটি এইট শেষ হয়েছে ক্যাসলআইল্যান্ডে, লোক সংখ্যা হাজার খানেকের কিছু কম। সেকেন্ডারি রোড এল-নাইন ধরে গেলে পরবর্তী শহর কানটার। আর ষাট মাইল দূরে মালো। মালোর লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার, ছোট একটা এয়ারপোর্টও আছে, বিশ-পঁচিশজন পুলিসও থাকার কথা।

ট্রাক নিয়ে রওনা হলো রানা, মনে নানারকম ভয় আর সন্দেহ। পুরানো বন্ধু জ্যাক ফেরি সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করছে, এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। আইএনসিসি-র ডিরেক্টর ডীন র‍্যাদারফোর্ডও সিন্ডিকেটের একজন ছিলেন। কিন্তু শুধু এই দু'জন মিলে সিন্ডিকেটটা চালাচ্ছিল, এটা বিশ্বাস করা যায় না। কয়েক বিলিয়ন ডলারের অবৈধ ব্যবসা, এর সঙ্গে আরও হোমরাচোমরা কর্তাব্যক্তিরা জড়িত। খেতে আফিমের চাষ বন্ধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় রানার, দায়ী লোকগুলোকে ধরতে চায় ও। টোপ বা জাল যাই বলা হোক, একটা ফেলে রেখেছে, ভবিষ্যৎই বলতে পারবে কারা বা ক'জন তাতে ধরা পড়ে। কিন্তু উলরিখ বাউচার? ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও এই ভদ্রলোককে দীর্ঘদিন ধরে চেনে রানা, তাঁর সম্পর্কে জানেও অনেক কিছু। জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখায় তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাজ করেছেন, মানবকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে পরিচিত। এ কি বিশ্বাস করার কথা যে তিনিও সিন্ডিকেটের অন্যতম একটা মাথা?

না। রানা একথা বিশ্বাস করে না।

কিন্তু বাউচার যদি ধোয়া তুলসী পাতা হন, ডোনার কাছ থেকে খবর পাবার পরও তিনি কোন অ্যাকশন নেননি কেন? ডোনা

যদি তাঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, ওর পাঠানো ফিল্ম আর আফিম ফলের নমুনা তো তিনি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন, তাই না?

হঠাৎ হতাশায় ছেয়ে গেল মন। রানা ভাবল, আমি কি বোকা! ফেরি আয়ারল্যান্ড কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সে ইচ্ছে করলেই পোস্ট-অফিসের মাধ্যমে পাঠানো যে-কোন পার্সেল চেক করার নামে নিজের হেফাজতে আনতে পারে। ভুয়া পুলিস অ্যাথেয়ার ডাকবাক্সে পার্সেলটা পায়নি, না পেয়ে নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে তথ্যটা জানিয়ে দিয়েছে ফেরিকে। আর ফেরি কি করেছে? সে পোস্টাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে লন্ডনগামী যে-কোন পার্সেল আটকাতে হবে, পাঠিয়ে দিতে হবে তার অফিসে—ইন্সপেকশনের জন্যে।

মাথায় আরও কত দুশ্চিন্তা ঢুকছে। সঙ্গে পাসপোর্ট-ভিসা নেই, পরিচয়-পত্র নেই, অস্ত্র নেই, টাকা-পয়সাও নেই। সম্পূর্ণ একা ও, কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এখন পর্যন্ত একমাত্র বন্ধু হিসেবে টিকে আছে বৃষ্টিটা। বৃষ্টির জন্যেই সিন্ডিকেটের লোকেরা ওর খোঁজে কম্বিং অপারেশন চালাতে পারছে না। ফার্মে কোন পুলিস হানা দেয়নি, তবে সাবধানের মার নেই ভেবে হেরোইন সরিয়ে ফেলছে তারা। 'শালা ফেরি, তোকে আমি ছাড়ব না!' বিড়বিড় করল রানা, দাঁতে দাঁত ঘষল।

একটা পাহাড় চূড়া থেকে নামার সময় ট্রাকের স্পীড দাঁড়াল ঘণ্টায় আশি মাইল।

ক্যাসলআইল্যান্ডে থামল না রানা, তবে স্পীড কমিয়ে আনল। শহরের পুব দিক থেকে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে। কানটার-এর দিকে ছুটল ট্রাক। মাইলস্টোনে লেখা রয়েছে ত্রিশ মাইল দূরে ওটা।

ক্যাসলআইল্যান্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে চৌরাস্তা পড়ল। পাশেই ছোট একটা গ্রাম, নাম স্কারটাগলিন। গ্রামে একটাই পাব, ওটার সামনে ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়ল রানা। পাব মালিক দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল, বুকে হাত ভাঁজ করে রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে। 'পাব খুলতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরি আছে,' ভারী গলায় বলল সে।

অমায়িক হেসে রানা বলল, 'জানি। কিন্তু আমার একটা টেলিফোন করা দরকার।'

পথ ছেড়ে দিল লোকটা। 'তাহলে আলাদা কথা।' ভেতরে ঢুকে ফোনটা দেখিয়ে দিল।

ডাইরেক্ট ডায়াল, লক্ষ করে স্বস্তিবোধ করল রানা।

'আপনি বিদেশী, তাই না? উন্মাদ লোকটার কাজ করছেন, গোস্ট ভ্যালী ভিনিয়ার্ডের মালিকের?' মাথা নাড়ল পাব মালিক। 'আয়ারল্যান্ডে ওয়াইন তৈরি করবে! শুনলে একটা পাগলও হাসবে।'

লোকটার দিকে ফিরল রানা। 'মালিককে আপনি চেনেন?'

'পাগলের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? লোকটা সম্পর্কে শুনেছি, দেখিনি কখনও। লোকে বলে ডাবলিনের একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক। সরকারের বড় কোন পদে আছে। ভেবে দেখুন, তার ধারণা তাঁবুর ভেতর আঙুর ফলাতে পারবে!' হেসে উঠল।

'আমার কাছে খুচরো পয়সা নেই, দশ পাউন্ডের নোট,' বলল রানা। 'ভাঙতি হবে?'

লোকটা ইতস্তত করছে।

রানা আবার বলল, 'এগ স্যান্ডউইচ আর কফি পেলেও ভাল হত, এখনও আমার নাস্তা খাওয়া হয়নি।'

পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল লোকটা। 'এত সকালে দশ পাউন্ডের ভাঙতি পাব কোথায়।

আপনি ফোন করুন, আমি নাস্তা তৈরি করি। যাবার সময় পেমেন্ট করবেন।'

'স্যান্ডউইচ আর কফি একটা ব্যাগে ভরে দিন, প্লীজ,' বলল রানা। 'এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

অপারেটরের নম্বরে ডায়াল করল রানা, কল-এর বিল কোত্থেকে আদায় করতে হবে ব্যাখ্যা করল, তারপর আইএনসিসি-র লন্ডন হেডকোয়ার্টারের নম্বর দিল।

'মাসুদ ভাই! সত্যি আপনি?...ঈশ্বর, তোমাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব! মাসুদ ভাই, আপনি কোথায়? আপনার খোঁজে কোথায় না আমি ফোন করেছি! কি ঘটেছে? কোথায় আপনি? কেমন আছেন...'

'শান্ত হও, ডোনা। আমি ভাল আছি। মি. বাউচারকে সব কথা বলেছ তুমি?'

'মাসুদ ভাই, আপনার একটা প্রশ্নেরও আমি জবাব দেব না! আগে বলুন কোথায় আপনি। আমি জানতে চাই, আপনার কোন বিপদ হয়েছে কিনা...'

হেসে উঠল রানা। 'বোকা মেয়ে! ঠিক আছে, তুমিই জিতলে। শোনো, ডোনা, আমার বন্ধু জ্যাক ফেরি অনেক আগেই পচে গেছে–সে সিন্ডিকেটের লোক। পুলিসের বদলে আমার পিছনে বন্দুকবাজ একটা দলকে লেলিয়ে দিয়েছে।'

ডোনার হাঁপিয়ে ওঠার আওয়াজ পেল রানা। 'ওহ্, মাই গড!'

'তবে চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'ওরা আমাকে ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু জ্যাক ফেরি? এ কিভাবে সম্ভব?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে

চাইল ডোনা। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ ভাই, সত্যি কথা বলুন! আপনার কিছু হয়নি তো?'

'কিছু হলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম?' হাসছে রানা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ডোনা, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। এবার বলুন কি জানতে চান। আপনি এখন কোথায়?'

'ট্রালীর ত্রিশ মাইল পুবে, স্কারটাগলিন-এ,' বলল রানা। 'ওদের একটা ট্রেইলর ফিট করা লরি হাইজ্যাক করেছি। ট্রেইলরে সম্ভবত প্রচুর হেরোইন আছে। লরি নিয়ে মালো-য় পৌঁছুতে চাই, ওখানে পৌঁছুতে পারলে পুলিসের সাহায্য পাব। এবার বলো, মি. বাউচার কি করছেন?'

ডোনার গলা অস্পষ্ট শোনাল, রানার সন্দেহ হলো ফোঁপাচ্ছে। 'মি. বাউচার লন্ডনে নেই, মাসুদ ভাই। আমার কাছ থেকে সব কথা শোনার পর তিনি কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছেন, এমনকি স্ত্রীকেও কিছু বলে যাননি। ওদিকে আমাদের এজেন্সির অফিসে স্বাতীও নেই। আপনার ফ্ল্যাটেও সে যায়নি। এমনকি ফরহাদ ভাইও অফিস করছেন না। কোথাও গেছেন ওরা, কিন্তু আমাকে কিছুই বলে যাননি। এখানে একা আমি চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। পোস্ট অফিসে বারবার ফোন করে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু আপনার পাঠানো পার্সেলটা এখনও পৌঁছায়নি...'

'এখনও যখন পৌঁছায়নি, আর পৌঁছাবেও না। শোনো, ডোনা, তুমি আমাদের এজেন্সির অফিসে চলে যাও। ফরহাদ আর স্বাতী যেখানেই যাক, ঠিকই ওরা এক সময় অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওদেরকে তুমি জানাবে, জ্যাক ফেরি সিন্ডিকেটের লোক। আরও বলবে, লরি নিয়ে মালোতে যাচ্ছি আমি। ফেরি পার্সেল আটকে দেয়ায় এই লরিই এখন একমাত্র প্রমাণ, কাজেই এটা নিয়ে আয়ারল্যান্ড থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করব আমি। সময়

নেই, আপাতত রাখি।'

'মাসুদ ভাই, লরির সঙ্গে থাকলে ওরা আপনাকে সহজেই খুঁজে পাবে। তারচেয়ে লরি ফেলে আয়ারল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না?'

'লরিতে হেরোইন আছে, ডোনা,' বলল রানা। 'ওটা ফেলে গেলে কার কাছে কি প্রমাণ করব আমি?'

'মাসুদ ভাই, এক মিনিট...'

'সময় নেই, ডোনা,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

পাহাড়ী পথ ধরে ঘণ্টায় বিশ মাইল স্পীডে ট্রাক চালাচ্ছে রানা। কাঁকর ছড়ানো রাস্তা খানা-খন্দে ভরা, রাস্তার এক পাশে ভাঙা পাঁচিল, তারপরই গভীর খাদ। পুব দিকে যাচ্ছে ও। এই পথ টি-থারটিতে মিশেছে আরও পঞ্চাশ মাইল সামনে। সেখান থেকে মালো বারো কি তেরো মাইল পশ্চিমে। কিন্তু বৃষ্টি যদি না কমে আর পথটা যদি আরও দুর্গম হয়ে ওঠে, ঘুরপথ ধরতে বাধ্য হবে ও, সেক্ষেত্রে টি-থারটিন যেখানে উঠবে সেখান থেকে মালোর দূরত্ব দাঁড়াবে ত্রিশ মাইল।

দুপুরের পর ভাগ্য ওর বিরুদ্ধে চলে গেল। ছোট্ট গ্রাম নিউমার্কেট পিছনে ফেলে পাঁচ মাইল এগিয়েছে, সামনে পড়ল দীর্ঘ একটা কাঠের ব্রিজ। ব্রিজের নিচে নদীটা তেমন চওড়া নয়, তবে দেখে মনে হলো খুবই গভীর, আর স্রোতও জোরাল। নদী চওড়া না হলেও, খাদটা বিশাল, তাই ব্রিজটাও লম্বা করতে হয়েছে। ব্রিজ থেকে বিশ গজ দূরে ট্রাক থামাল রানা। নিচে নেমে হেঁটে ব্রিজের ওপর চলে এল, পরীক্ষা করে দেখছে ট্রাক আর ট্রেইলরের ভার সহ্য করতে পারবে কিনা।

হতাশায় মাথা নাড়ল রানা। শুধু ট্রাক নিয়ে হয়তো পার হওয়া সম্ভব, তাতেও ঝুঁকির পরিমাণ কম নয়; কিন্তু ট্রেইলর সহ ট্রাক

নিয়ে ব্রিজে উঠলে স্রেফ আত্মহত্যা করা হবে।

ট্রাক আর ট্রেইলরের মাঝখানের কাপলিং পরীক্ষা করল রানা। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা কোন সমস্যা নয়। ট্রাকের দিকে পিছন ফিরে ব্রিজের নিচে তাকাল ও। রাস্তার ডান পাশের পাঁচিলটা ভাঙা। তারপর শুরু হয়েছে দীর্ঘ ঢাল। কোন গাছপালা নেই, শুধুই ঝোপ-ঝাড় আর ঘাস।

মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যাবে চড়ল আবার। ব্রিজের পিছনে, রাস্তার ওপর, আড়াআড়ি ভঙ্গিতে আনল ট্রাক আর ট্রেইলর। ট্রেইলরের পিছনটা থাকল রাস্তার কিনারায়। কাপলিং খুলতে মিনিট সাতেক লাগল। ক্যাবে চড়ে স্টার্ট দিল রানা, ব্যাক গিয়ার দিয়ে একটু একটু করে ট্রাক নিয়ে পিছু হটছে। রাস্তার কিনারা থেকে ঢালে নেমে যাচ্ছে ট্রেইলরের পিছনের দুই চাকা। আরও কয়েক ইঞ্চি পিছু হটল ট্রাক, তারপর রানা ব্রেক কষতে ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করেছে ট্রেইলরের চার চাকা, তীরবেগে নেমে যাচ্ছে নিচে।

ক্যাব থেকে মাথা বের করে তাকিয়ে থাকল রানা। ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছে বিরাট এক লাফ দিল ট্রেইলরটা, পড়ল নদীর মাঝামাঝি পানিতে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছলকে উঠল পানি। ট্রেইলরটা দেখা যাচ্ছে না, ডুবে গেছে।

ক্যাব থেকে নেমে রাস্তার কিনারায় প্রস্রাব করতে দাঁড়াল রানা। এই ফাঁকে এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকটা আরেকবার দেখে নিচ্ছে। ফেলে আসা পথে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

বৃষ্টির মধ্যে দৃশ্যটা পরিষ্কার নয়, তবে সবুজ রঙের ট্রাক আর ট্রাকের মাথায় দাঁড়ানো লোকগুলোকে ঠিকই দেখতে পেল ও। অনেক দূরে রয়েছে ওরা, একটা পাহাড়-চূড়া। রানা তাকিয়ে আছে, চূড়া থেকে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ট্রাক। এক সময়

ঢালের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকেই আসছে, তবে ব্রিজে পৌঁছুতে হলে আর ওরকম তিনটে পাহাড় চূড়া টপকাতে হবে ড্রাইভারকে।

তাড়াতাড়ি ক্যাবে উঠে বসল রানা। স্টার্ট দিয়ে সাবধানে ব্রিজ পেরুচ্ছে। ব্রিজটা দোল খাচ্ছে, অকস্মাৎ ভেঙে পড়লে কিছুই করার নেই। তবে কোন বিপদ ঘটল না; নিরাপদেই পার হয়ে এল রানা। ব্রেক করে ট্রাক থামিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও, তারপর ক্যাবের মাথায় উঠে পড়ল।

হাতে ব্যাটারিচালিত করাতটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের মাঝখানে চলে এল রানা। মোটা কাঠের স্লীপার আড়াআড়িভাবে বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্রিজটা। দু'পাশে সমান্তরাল চওড়া কড়িকাঠ আছে, স্ক্রু দিয়ে স্লীপারগুলো ওই কড়ির সঙ্গে আটকানো। করাত দিয়ে স্লীপারের একটা দিক কাটতে শুরু করল রানা। করাতটা আরও বড় হলে কাজটা শেষ করতে দশ মিনিটের বেশি লাগত না। দশটা স্লীপার কাটতে পঁচিশ মিনিট বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আরও একটা পাহাড়-চূড়া পার হয়েছে সিন্ডিকেটের ট্রাক।

কাজটা শেষ করে কাঠের গুঁড়ো এক জায়গায় জড়ো করল রানা, তারপর ফেলে দিল ব্রিজের নিচে। পিছিয়ে এসে স্লীপারগুলোর দিকে তাকাল। ট্রাক থেকে নেমে কেউ যদি কাছ থেকে সরাসরি না তাকায়, কাটার চিহ্ন চোখে পড়বে না।

ব্রিজ ছেড়ে ট্রাকের ক্যাবে উঠে বসল রানা। স্টার্ট দিয়ে রওনা হলো আবার। ঢাল বেয়ে নেমে এল উপত্যকায়, সামনে আরেকটা পাহাড়-চূড়া। ওই চূড়ায় ওঠার পর ট্রাক থামিয়ে ক্যাবের মাথায় চড়ল, তাকিয়ে আছে পিছনে ফেলে আসা ব্রিজটার দিকে।

শেষ পাহাড়-চূড়া টপকে থকথকে কাদার ওপর দিয়ে মন্থর বেগে এগিয়ে আসছে সবুজ ট্রাক, স্পীড পঁচিশ মাইলের বেশি নয়।

সামনে ব্রিজ দেখেও থামল না ড্রাইভার, এমনকি গতিও কমাল না।

ব্রিজের মাঝামাঝি চলে এসেছে ট্রাক, তারপর আর কিছু দেখতে পেল না রানা। চোখের পলক পড়ারও আগে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটা। দূর থেকে লম্বা ব্রিজটাকে বার কয়েক শুধু দুলতে দেখল ও।

পাহাড়-চূড়া থেকে ট্রাক নিয়ে নামছে রানা, আকাশ থেকে ঝেঁটিয়ে সমস্ত মেঘ সরিয়ে নিয়ে গেল তীব্র বাতাস। বৃষ্টি না থাকায় এখন রানা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। মনটা আনন্দে নেচে উঠল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে যাচ্ছে, সামনে কোন লোকালয় পেলে নাভির ওপরের খাদটা ভরতে হবে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, আশাটা পূরণ হলো না। ব্রিজ পেরোবার পর সাত মাইলও যায়নি, আবার হাজির হলো বিপদ। আওয়াজ শোনার আগেই হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল ও। ফাঁকা উপত্যকার ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে উড়ে আসছে।

ট্রাককে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল পাইলট। তারপর আধ মাইল সামনে সমতল রাস্তার মাঝখানে ল্যান্ড করল।

আট

এটা সেই সিকোরস্কি প্যাসেঞ্জার হেলিকপ্টার, দু'দিন আগে ফার্মে যেটা দেখেছিল রানা। রোটর ব্লেড স্থির হতেই কেবিনের দরজা

খুলে গেল, নিচে নামল তিনজন সশস্ত্র লোক। একজন তার রাইফেল তুলে গুলি করল। ঝাঁকি খেলো রানা, তবে বুলেটটা প্যাসেঞ্জার সাইডের উইন্ডস্ক্রীনে নিখুঁত একটা ফুটো তৈরি করে ভেতরে ঢুকল, বিস্ফোরিত হলো রানার পাশের সীটের প্যাড লাগানো পিঠ, ক্যাবের ভেতর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ফোম-রাবার আর প্লাস্টিকের টুকরো। ওকে খুন করার জন্যে গুলিটা করা হয়নি, উপলব্ধি করে ক্ষীণ একটু স্বস্তিবোধ করল রানা। ব্রেক লাইট বারকয়েক জ্বালল আর নেভাল ও, ট্রাকের গতি কমিয়ে আনল যতটুকু সম্ভব।

হেলিকপ্টারের কাছাকাছি এসে রাইফেল মাজলের পিছনে লোকটার মুখ লক্ষ করল রানা, শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী। বাকি দু'জন হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজে হেলান দিয়ে রয়েছে, হাতে বাগিয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র। পালাবার বা কোন রকম কৌশল করার উপায় নেই ওর। রাস্তার এক ধারে সরু একটা পাঁচিল, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, আরেক ধারে ঢাল, ঢালের নিচে খোলা মাঠ, মাঠের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে একটা খাল। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন জনবসতি বা লোকজন নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে হেলিকপ্টারের বিশ ফুট দূরে ট্রাক থামাতে হলো ওকে। বড় করে শ্বাস টেনে বুকে বাতাস ভরল, দরজা খুলে নেমে পড়ল ক্যাব থেকে।

রাইফেল নিচু করে রানার নাভিতে তাক করল লোকটা। বাকি দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে, একজন উল্লাস চেপে রাখতে না পেরে ফিউজিলাজে একটা ঘুসি মারল।

'গুড আফটারনুন, মি. মাসুদ রানা,' বিদ্রূপাত্মক একটা কণ্ঠস্বর শুনল রানা; লোকটা কেবিন থেকে নেমে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। 'হ্যাঁ, মানতেই হবে, মানুষকে আপনি ভোগাতে পারেন!' ঠোঁটের কোণে হাসি থাকলেও সেটা আসলে ক্রোধ বা আক্রোশ

চেপে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস বলে মনে হলো রানার। রানার দুই হাত সামনে থামল সে। 'আমার নাম জেরি সনডার্স। ট্রেইলরটা কোথায়, সে প্রশ্নে আমি পরে আসছি। তার আগে বলুন, ট্রাকের কার্গো সব ঠিক আছে তো?' নিজের লোকদের দিকে না তাকিয়েই একটা হাত নাড়ল সে। তিনজনের একজন রানাকে পাশ কাটিয়ে ট্রাকের দিকে এগোল।

দেড় মিনিট পর ট্রাকের পিছন থেকে তার চিৎকার ভেসে এল, 'মি. সনডার্স, মাত্র একটা বাক্সের তালা ভাঙা হয়েছে, তবে ভেতর থেকে কিছু সরানো হয়নি।'

সনডার্স আবার হাত নাড়ল। ট্রাক থেকে নেমে এসে রানার সামনে দাঁড়াল লোকটা, হাতে একজোড়া হ্যান্ডকাফ। রানার হাত দুটো এক করে হাতকড়া পরিয়ে দিল সে।

রানাকে পাশ কাটিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল লোকটা, যাবার পথে হ্যান্ডকাফের চাবিটা সনডার্সের হাতে গুঁজে দিল। সনডার্স রানার দিকে পিছন ফিরে হেলিকপ্টারের দিকে এগোল।

দু'জন গার্ড ট্রাকে চড়ল। বাকি একজন রানাকে ঠেলে তুলে দিল হেলিকপ্টারে। পিঠে গান মাজল লেগে আছে, আইল ধরে কেবিনের পিছন দিকে হেঁটে এল রানা। হেলিকপ্টারের পিছন দিকে মুখ-করা একটা সীটে বসতে বলা হলো ওকে। লোকটা বসল ওর সামনের সীটে, ব্যারেল কাটা ব্রাউনিং শটগানটা কোলের ওপর ধরে রেখেছে, রানার বুকে তাক করা।

আইল ধরে এগিয়ে এল সনডার্স। রানার চোখে চোখ রেখে হাসল সে, টান টান হয়ে আছে প্রসারিত ঠোঁট। ককপিট থেকে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে পাইলট, তার উদ্দেশে হাত তুলে বুড়ো আঙুলটা ঝাঁকাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল জোড়া এঞ্জিন। রোটর ব্লেডের

আওয়াজে এঞ্জিনের শব্দ ভোঁতা হয়ে উঠল। এক্সপ্রেস লিফট-এর মত রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল যান্ত্রিক ফড়িং।

ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে হেলিকপ্টার, শেষ বিকেলের রোদ লেগে সোনালি ও গাঢ় সবুজ দেখাচ্ছে প্রকৃতিকে। পাহাড়ের পাশে সরু সুতোর মত একটা মেঠো পথ দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে, পথের পাশে ঢাল, সেখানে ভেড়ার একটা পাল চরছে।

আইলের আরেক পাশ থেকে রানার দিকে একবার তাকাল সনডার্স, সামনের সীটে ফেলে একটা ব্রীফকেস খুলল। কয়েক মিনিট ধরে ভেতরের কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল সে। রানা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মনটা শক্তই আছে ওর, তবে জানে ওর মুখ খোলার জন্যে এমন কোন টরচারিং টেকনিক নেই যা ওর ওপর ব্যবহার করা হবে না।

'মি. রানা, ভেবেছিলাম অল্প কয়েকটা প্রশ্ন করলেই চলবে,' বলল সনডার্স, ব্রীফকেসে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডার অন করল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'কিন্তু আপনার কীর্তিকলাপ প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। আগের প্রশ্ন পরে, পরের প্রশ্ন আগে করতে হবে আমাকে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'প্রথম প্রশ্ন, ট্রেইলরটা কোথায়?'

'এই মুহূর্তে?' জোর করে হাসল রানা। 'কর্কের পথে থাকার কথা। ক'টা বাজে জানলে বলতে পারতাম বন্দরে পৌঁছে গেছে কিনা।'

'ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ,' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল সনডার্স।

'দশ-বারো মাইল পিছনে ছোট্ট একটা গ্রাম পাই আমি, নামটা বলতে পারব না,' বলল রানা। 'এক হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে একটা ট্রাক ভাড়া করি, ড্রাইভারকে বলি ট্রেইলর নিয়ে সোজা কর্কে যেতে হবে। বন্দর পুলিসকে আমার লেখা একটা চিরকুট দেবে সে।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সনডার্স। 'বিশ্বাস করলাম না। আপনার খোঁজে কর্কের দিকে বহুদূর গেছি আমরা 'কপ্টার নিয়ে, পথে কোন ট্রেইলর সহ ট্রাক দেখিনি।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'আর আমাদের ট্রাকটা? যেটা আপনাকে অনুসরণ করছিল?' সনডার্সের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'কেন, পিছনের ব্রিজটা দেখেননি? এমনিতেই ওটা নড়বড়ে ছিল, আমি ট্রাক নিয়ে পার হবার সময়ই ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল। ট্রাক থামিয়ে হাত নাড়ি আমি, ব্রিজে উঠতে নিষেধ করি, কিন্তু ড্রাইভার আমার বারণ শোনেনি। ব্রিজটা ঠিক মাঝখানে ভেঙে যায়, কয়েকটা স্লীপার সহ নদীতে পড়ে গেছে। অসম্ভব স্রোত, পানির ওপর আমি কাউকে ভেসে উঠতে দেখিনি। ক'জন ছিল?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সনডার্স। তারপর বলল, 'হেলিকপ্টারে বেশি জায়গা নেই, কিন্তু তারপরও হার্ডি আপনাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিতে পারবে। কথাটা আপনাকে বিশ্বাস করতে বলি। কি, হার্ডি?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার সময়ও পেল না রানা, ওর হাঁটুর নিচের শক্ত হাড়ে বুট দিয়ে লাথি মারল হার্ডি। গুঙিয়ে উঠল রানা। পরমুহূর্তে বুকে ঘুসি খেলো, ফলে খালি হয়ে গেল ফুসফুস। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল ওর, বমি পেল, কিন্তু হার্ডি বিরতি নিচ্ছে না। ওর চুলের গোছা মুঠোয় ভরে ওপর দিকে টান দিল, চোয়ালে পড়ল এসে আরেকটা প্রচণ্ড ঘুসি। ছেড়ে দিতে সীট থেকে রানার শরীর অর্ধেকটা ঝুলে পড়ল মেঝের দিকে।

রানা দম ফিরে পেয়ে সীটে না বসা পর্যন্ত শান্তভাবে অপেক্ষায় থাকল সনডার্স। 'বিশ্বাস হলো তো, মি রানা? হার্ডি সত্যি ব্যথা দিতে জানে।'

বুকের পাঁজর ভেঙে গেছে বলে সন্দেহ হলো রানার, নিঃশ্বাস ফেলার সময় ব্যথা করছে। হাঁটুর নিচে হাড়েও ফাটল ধরে থাকতে

পারে, পা-টা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে। সেই সঙ্গে তীব্র জ্বালা অনুভব করছে, সম্ভবত বুটের আঘাতে এক ফালি চামড়া উঠে গেছে। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়ালেও, ওখানে কোন ব্যথা অনুভব করছে না। চোয়ালটা নাড়াচাড়া করতেও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

'হার্ডি কয়েক বছর আই.আর.এ-র সঙ্গে ছিল তো,' বলল সনডার্স, 'ওকে আপনি তথ্য আদায়ে বিশেষজ্ঞ বলতে পারেন। ওর হাতে পড়লে মাঝে-মধ্যে দু'একজন মারা যায় বটে, তবে তথ্য আদায়ের আগে নয়।'

মেঝেতে এক দলা রক্ত ফেলল রানা, একটুর জন্যে হার্ডির বুটে লাগল না। 'ইউ সান অব আ বীচ,' বিড়বিড় করল ও, পরবর্তী আঘাতের জন্যে শক্ত করল পেশী, তবে চোখের কোণ দিয়ে দেখল মাথা নেড়ে হার্ডিকে নিষেধ করল সনডার্স। 'বাস্টার্ডটা আমাকে খুন করতে পারে, জানি, কিন্তু তাতে কি তথ্যগুলো পাবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সনডার্স। তারপর সামনের সীট থেকে ব্রীফকেসটা কোলে টেনে নিল। 'দেখুন, মি. রানা।' ব্রীফকেসের ভেতর প্লাস্টিকের কয়েকটা পকেট রয়েছে, প্রতিটি পকেটে বিভিন্ন ধরনের ফাইল দেখল রানা। একটা পকেটে রয়েছে এক জোড়া হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। 'কথাটা ঠিক, মি. রানা। মরা মানুষ তথ্য দিতে পারে না। তবে হার্ডিকে বারণ করা আছে, আপনাকে একেবারে মেরে ফেলবে না। সে আপনার মুখ খোলাতে ব্যর্থ হলে দায়িত্ব চাপবে আমার ওপর। স্কোপালামিন-এর সঠিক ডোজ দিলে তোতা পাখির মত বকবক করবেন আপনি। তবে সাইড এফেক্টটা মারাত্মক। হার্ডি?'

হার্ডি নিঃশব্দে হাতের শটগানটা সনডার্সের দিকে বাড়িয়ে ধরল। অস্ত্রটা হাত-বদল হয়েছে কি হয়নি, অকস্মাৎ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আবার রানার মুখে আঘাত করল হার্ডি। সীটের

পিছনে বাড়ি খেলো রানার মাথা। ওকে শক্তি যোগাল প্রবল আক্রোশ। হার্ডি ওর অক্ষত পা লক্ষ্য করে বুট চালাল, কিন্তু রানা এবার তৈরি ছিল। হার্ডির আগে ও-ই পা চালিয়েছে, লাথিটা লাগল হার্ডির হাঁটুর ঠিক নিচে। গুঙিয়ে উঠল হার্ডি, পিঠটা সেঁটে গেল সীটের পিছনে। সময় দিল না, ওই একই পা তুলে তার পেটে কষে আরেকটা লাথি মারল রানা। শটগানের বাঁট দিয়ে ওর কাঁধে বাড়ি মারল সনডার্স, ছিটকে জানালার সঙ্গে সেঁটে গেল ও। সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হার্ডি, এক পা এগিয়ে ঘুসি মারল রানার কপালের পাশে। পিছিয়ে গেল আবার, লাথি মারল পেটে। ভারী বস্তার মত সীট থেকে মেঝেতে পড়ে গেল রানা। উন্মাদের মত দিশেহারা দেখাচ্ছে হার্ডিকে, চোখে খুনের নেশা। এক পা করে পিছিয়ে এসে বারবার রানার পেটে আর বুকে লাথি মারছে, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। 'সাবধান!' গর্জে উঠল সনডার্স। খোলা ব্রীফকেস রেখে দাঁড়াল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল হার্ডিকে। 'ব্যাটা গর্দভ! এখুনি কে ওকে খুন করতে বলেছে? বসো, নিজেকে সামলাও।'

টলতে টলতে সীটের দিকে এগোল হার্ডি, সনডার্সকে পাশ কাটাবার সময় শটগানটা ছিনিয়ে নিল। নিঃসাড় রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সনডার্স, ঠেলে চিৎ করল শরীরটা, জখমগুলো পরীক্ষা করছে। 'তুমি সত্যি একটা গাধা!' হিসহিস করে বলল সে। 'এই লোক সাংঘাতিক বিপজ্জনক। ফার্ম দেখে বেরুবার পর গত তিনদিন ধরে ঘোল খাইয়েছে আমাদের। কি জানে, ট্রেইলরটা কোথায় পাঠিয়েছে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, কিছুই এখনও আমরা জানি না। যদি মারা যায়? ডাবলিনের ওঁরা আমাদের ছাড়বেন? খবরদার, তুমি ওর গায়ে হাত দেবে না আর!'

কথাগুলো অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা। ভান করে পড়ে থাকল, যেন এখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি।

'ট্রেইলরটা কোথাও পাঠায়নি,' বলল হার্ডি। 'কোন জঙ্গলের ভেতর বা নির্জন গোলাঘরে লুকিয়ে রেখেছে।'

'কথা বলার সময় সাবধান কিন্তু,' হুঁশিয়ার করে দিল সনডার্স। 'কর্তাদের কারও পরিচয় যেন ফাঁস না হয়। এ লোক এখনও জানে না লন্ডনে কে তার শত্রু।'

হেসে উঠল হার্ডি। 'ঈশ্বর বুঝতে পারছেন কে গাধা,' হাসি থামিয়ে বলল সে। 'কর্তাদের পরিচয় বা শত্রুর নাম জানলে কি ক্ষতি হবে ব্যাখ্যা করো। একবার যখন ধরেছি, আমরা কি ওকে বাঁচিয়ে রাখব?'

'শোনো, হার্ডি। আমি বলতে চাইছি আমাদের কোন ভুল করা চলবে না। ডি.আর. ভুল করেছিলেন, আত্মহত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমরা ভুল করলে তার কি পরিণতি হবে কল্পনা করতে পারো? এইচ.সি. লুটন আর এম.জি ফাইবারকে তুমি চেনো? ওঁরা স্রেফ জ্যান্ত কবর দেবেন আমাদের।

হার্ডি জিজ্ঞেস করল, 'মি. বাউচারের ব্যাপারটা কি?'

'জানি না!' রেগে উঠছে সনডার্স। 'জানলেও তোমাকে বলতাম না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল হার্ডি।

পাঁচ মিনিট পর নড়ল রানা। ব্যথায় সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'আপনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন, মি. রানা,' শান্ত গলায় বলল সনডার্স। 'ভয় হচ্ছিল মারাই যান কিনা। হার্ডি আসলে খেপে গিয়েছিল'। ওকে আপনার দ্বিতীয়বার খেপানো উচিত হবে না।'

অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাল রানা। ওকে ধরে তুলল সনডার্স, সীটে বসিয়ে দিল আবার। 'ব্যস্ততার কিছু নেই, আস্তে-ধীরে জবাব দিন। কি, সহযোগিতা করতে রাজি তো?'

রানা ব্যথায় গোঙাচ্ছে।

'আমাদের ট্রাক আর ট্রেইলর প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসব,' বলল সানডার্স। 'তার আগে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিন।' ব্রীফকেস টেনে নিয়ে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জে রঙিন তরল পদার্থ ভরল সে। 'আপনি সহযোগিতা না করলে ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করতে বাধ্য হব। সাইড এফেক্টের জন্যে আপনি নিজেই দায়ী থাকবেন। ভাল কথা, আপনি মারাও যেতে পারেন।'

'কি জানতে চাও?' বিড়বিড় করল রানা।

'ঋজু মুর্তজা কোপেনহেগেন থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, কিন্তু আইএনসিসি আর রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা থেকে আমাদের লোকেরা তার রিপোর্ট ফ্যাক্স মেশিন থেকে সরিয়ে ফেলে। আপনাদের নতুন শাখা প্রধান ফরহাদ দুই অফিসের দু'জন নাইট গার্ডকে ইন্টারোগেট করে নেকটারের নাম জানতে পারে। নেকটারকে গ্রেফতার করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। সে মি. ডীন র‍্যাদারফোর্ডের শোফারের নাম বলে। শোফার র‍্যাদারফোর্ডের পরিচয় ফাঁস করে দেয়। মি. র‍্যাদারফোর্ড অ্যারেস্ট হবার ভয়ে নিউ ইয়র্কে আত্মহত্যা করেন। এ-সবই আমরা জানি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, যেভাবেই হোক ঋজু মুর্তজার রিপোর্ট আপনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে-কথা আপনি কাউকে বলেননি। কেন?'

'এ প্রশ্নের এত কেন গুরুত্ব?' ব্যথায় কাতর রানাকে নেশাগ্রস্ত মাতালের মত লাগছে দেখতে।

'আপনি শুধু জবাব দেবেন, মি. রানা,' কঠিন সুরে বলল সনডার্স। 'রিপোর্টটার কথা চেপে যাবার কি কারণ? কাকে আপনি সন্দেহ করছিলেন?'

'কাউকে না,' বলল রানা। 'আমার কাজ করার পদ্ধতিই এরকম, প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কিছু না জানানো।'

'সত্যি কথা বলুন, তাতেই আপনার মঙ্গল। আপনি

বিশেষভাবে কাউকে সন্দেহ করেননি?'

মাথা নাড়ল রানা।

'ঋজু মুর্তজার রিপোর্টে কি ছিল আমরা জানি,' বলল সনডার্স। 'আয়ারল্যান্ডে আফিমের চাষ হচ্ছে, এ-কথা রিপোর্টে বলেনি সে। তথ্যটা আপনি পেয়েছেন আমেরিকান স্পেসওয়াচ সিস্টেমের স্যাটেলাইট ফটো থেকে, তাই না?'

'জানোই যখন, জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'জানি বৈকি, আমাদেরও তথ্য পাবার উৎস আছে। স্যাটেলাইট কি গোটা দুনিয়ার ওপর চোখ বুলাচ্ছিল, নাকি শুধু সন্দেহজনক এলাকায়?'

'ব্যাপারটা ওরা হঠাৎ দেখতে পায়, অ্যাক্সিডেন্টালি।'

'ঠিক কি বলতে চান? ওদের স্যাটেলাইট সিস্টেম অ্যাসিটিক হাইড্রাইডের সন্ধান পায়, তাই না?'

'নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার।'

'কাকতালীয়ভাবে আর কোথায় আফিমের চাষ সম্পর্কে জানতে পারে ওরা?' জিজ্ঞেস করল সনডার্স।

'ইরান, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ডের আরও কয়েকটা স্পট, বার্মা, পাকিস্তান, ভারতের আসাম রাজ্যে।'

'সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে,' বিড়বিড় করল সনডার্স। 'ক্যাসেটটা কর্তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'ফার্মে আপনি কি কি দেখলেন?'

'যা দেখেছি সবই তো জানিয়েছি জ্যাক ফেরিকে,' বলল রানা। 'তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো।'

'আপনার পোস্ট করা ফিল্ম আর পপি গাছের নমুনা আমরা পেয়েছি, কাজেই ওদিক থেকে কোন হুমকি নেই,' বলল সনডার্স। 'এখন প্রশ্ন হলো, মি. ফেরি সিন্ডিকেটের লোক, এটা জানার পর আপনি অবাক হননি?'

'না। কারণ আগেই তাকে আমার সন্দেহ হয়েছিল। একমাত্র সে-ই জানত যে আমি অ্যাথেয়ায় আছি।'

'হ্যাঁ, তা বটে, তিনি একাই জানতেন,' বিদ্রূপ করল সনডার্স। 'আরেকটা প্রশ্ন, মি. রানা। আজ আপনি লন্ডনের কোথাও ফোন করেছেন?'

'হ্যাঁ, আইএনসিসি হেডকোয়ার্টারে,' হাল ছেড়ে দেয়ার সুরে বলল রানা। 'কিন্তু মি. বাউচারকে পাইনি।' ডোনার নামটা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না, কারণ সে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে মনে করলে ওরা তাকে মেরে ফেলতে পারে।

মাথা ঝাঁকাল সনডার্স, চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। 'আমাদের পাওয়া তথ্যের সঙ্গে সবই দেখা যাচ্ছে মিলে যায়। এবার, মি. রানা, ট্রাক আর ট্রেইলর প্রসঙ্গে ফিরে আসি আমরা।'

'ট্রাকটা নদীতে পড়ে গেছে, ব্রিজের ওপর দিয়ে উড়ে গেলেই নিজের চোখে দেখতে পাবে,' বলল রানা। 'আর ট্রেইলরটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কর্কে পৌঁছে গেছে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও।

ইতিমধ্যে আয়ারল্যান্ডের উপকূল এলাকায় পৌঁছে গেছে হেলিকপ্টার, ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়ী এলাকা পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। মিনিট দশেক কোন কথা হলো না। তারপর জানালার দিকে হাত তুলে নিস্তব্ধতা ভাঙল সনডার্স, 'দ্য সেভেন হগস,' বলল সে।

কথাটা শুনে ক্রুর হাসি হাসল হার্ডি, জিভের ডগা বের করে ঠোঁট ভেজাল। বিড়বিড় করে কি যেন বলল তাকে সনডার্স, তারপর আইল ধরে হেঁটে চলে এল কেবিনের দরজার কাছে। ওখান থেকে রানা আর পাইলটের ওপর নজর রাখছে। ব্রীফকেসে হাত ভরে টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করল হার্ডি।

সাতটা দ্বীপকে ঘিরে চক্কর দিল হেলিকপ্টার, তারপর পশ্চিম

প্রান্তের শেষ দ্বীপটার ওপর চলে এল, প্রতি মুহূর্তে নিচে নামছে।

'নিচের ওই দ্বীপটায় আপনাকে আমরা রেখে যাব, মি. রানা,' কেবিনের দরজা থেকে বলল সনডার্স। 'মাঝরাতের দিকে ছোট একটা ফ্রেইটার আসবে, আমাদের রেখে যাওয়া একটা পার্সেল কালেক্ট করার জন্যে। ফ্রেইটারের ক্যাপটেনকে আপনি অভ্যর্থনা জানাবেন।'

রানার থেঁতলানো, ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে হার্ডি। রানার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। খুন করা হবে জানে, কিন্তু কিভাবে করা হবে বুঝতে পারছে না। সনডার্স কি হার্ডির হাতে তুলে দেবে ওকে? হার্ডি হাতের সুখ মিটিয়ে তারপর খুন করবে? নাকি গুলি করে মারা হবে?

হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো। দ্বীপটা খালি, জনবসতিহীন, সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। যেভাবেই বাঁচার চেষ্টা করুক, সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মনটা মরিয়া হয়ে উঠছে, কিন্তু মাথা থেকে কোন বুদ্ধি বেরুচ্ছে না। তবু ওর মতো মানুষ কখনোই হাল ছাড়ে না।

মৃত্যু অনিবার্য, মেনে নিয়েছে রানা। কিন্তু ওর ট্রেনিং ওকে দৃঢ়-প্রত্যয়ী হতে শিখিয়েছে। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, ভাল কিছু ঘটাতে না পারলে মন্দের ভাল কিছু একটা ঘটাতে হবে ওকে। মরবেই যখন, একা কেন?

মুখে আধো হাসি নিয়ে পিছন ফিরল হার্ডি, একহাতে শটগান, অপরহাতে ব্রীফকেস। হেলিকপ্টারকে সৈকত স্পর্শ করতে দেখছে, পানির কিনারা থেকে একশো গজ ভেতর দিকে। দ্বীপটা মেইনল্যান্ড থেকে বেশি দূরে নয়, কিন্তু নর্থ আটলান্টিক ধরে দু'হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ছুটে আসা বাতাস এতই তীব্র যে নিরাপদে নামতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পাইলট। ঠিক যখন সৈকত স্পর্শ করতে যাবে হেলিকপ্টার, দমকা বাতাসে একপাশে সরে গেল সেটা। ঝাঁকি খেয়ে ব্রীফকেস ছেড়ে দিল হার্ডি, সীট

আর্ম আঁকড়ে ধরল। কোল থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে শটগান, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরার চেষ্টা করল।

সুযোগের অপেক্ষায় ছিল রানা, শরীরটা মুচড়ে সঙ্গে সঙ্গে সীট থেকে লাফ দিল। বাতাসের চাপ সামলানোর জন্যে হেলিকপ্টারের নাক উঁচু করছে পাইলট, তাতে করে রানার গতি আরও বেড়ে গেল, হার্ডিকে ধাক্কা মারল যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। সংঘর্ষ ঘটার মুহূর্তে কনুই চালাল হার্ডির বুকে—একবার, দু'বার, তিনবার। হার্ডির মুখ থেকে হুস-হুস করে তিনটে আওয়াজ বেরুল, পুরোপুরি খালি হয়ে গেছে ফুসফুস। আরেকবার কনুই চালাল রানা, এবার হার্ডির গলা লক্ষ্য করে। কি লাভ বা ফল হয়েছে দেখার অপেক্ষায় থাকল না, মেঝেতে ডাইভ দিয়ে পড়ল, হাত বাড়াল ব্রীফকেস আর শটগানের দিকে।

সংঘর্ষের আওয়াজ পেয়ে ঝট করে ঘাড় ফেরাল সনডার্স, হাত চলে যাচ্ছে পিস্তলে। হেলিকপ্টার ঝাঁকি খেতে টলে উঠল সে, ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই দেখতে পেল রানার হাতে শটগান।

হ্যান্ডকাফ পরানো হাতে শটগানটা রিভলবারের মত করে ধরেছে রানা, ট্রিগার টেনে দিতে এক পলক দ্বিধা করল না। গর্জে উঠল অস্ত্রটা, বুলেটের ধাক্কায় দরজা দিয়ে ককপিটে ঢুকল সনডার্স, ছিটকে পড়ল রিজার্ভ কন্ট্রোল কলামে। হেলিকপ্টারের নাক অকস্মাৎ নিচু হলো, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বিশাল এক বোল্ডারে বাড়ি খেয়ে। রোটর ব্লেড টুকরো টুকরো হয়ে দিগ্বিদিক্ ছুটে গেল। কাত হয়ে বালিতে ঘষা খাচ্ছে হেলিকপ্টার। কেবিনের দেয়ালে ছিটকে পড়ল রানা, ফুটবলের মত ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল সীটের ওপর, মেটাল রিম-এ ঠুকে গেল মাথাটা। শটগানটা ফেলে দিয়েছে ও, কিন্তু ব্রীফকেসটা ছাড়েনি। কিছু একটা বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার, মাথার ওপর থেকে আগুনের লকলকে জিভ নিচের দিকে নেমে আসছে। জ্বলন্ত তেল

ঝরে পড়ছে কেবিনে।

পাশ ফেরা অবস্থায় স্থির হলো হেলিকপ্টার, হ্যাচওয়ে পাথরের গায়ে সেঁটে আছে। সামনের অংশটা ঢাকা পড়ে গেছে আগুনে। ঝর ঝর করে তেল ঝরছে, আতঙ্কিত রানাকে কেবিনের পিছন দিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করল। আগুনের শিখা এখন যে-কোন মুহূর্তে ফুয়েল ট্যাঙ্কের নাগাল পেয়ে যাবে। ইমার্জেন্সি এগজিটের দিকে এগোচ্ছে ও, এখন সেটা ওর ওপর দিকে, পিছনের বাল্কহেডের কাছে। হাতল ধরে নিচের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল, তারপর ভারী প্যানেলটা ঠেলে সরিয়ে দিল ওপর দিকে। আগুনের আঁচ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। খোলা হ্যাচওয়ের নিচে একটা সীটে উঠল রানা, হ্যাচওয়ের কিনারা আঁকড়ে ধরে লাফ দিল ওপর দিকে।

হেলিকপ্টারের একটা সাইড থেকে শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা। ওটার গা থেকে পিছলে নেমে যাবে, এই সময় দেখতে পেল আগুন আর ধোঁয়ার ভেতর কেবিনের মেঝেতে বসে রয়েছে হার্ডি, এক হাতে খামচে ধরে আছে গলাটা। আগুনের পর্দা ভেদ করে রানার দিকে তাকাল সে। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে, রানার মতই সীটের ওপর উঠে হ্যাচের কিনারা আঁকড়ে ধরল, কাপড়চোপড়ে আগুন ধরে গেছে।

ব্রীফকেস ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা, গড়িয়ে হেলিকপ্টার থেকে নিচে নামতে দেরি করছে। ওর মুখে হাসি নেই। চোখে শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি। হ্যান্ডকাফ পরা হাত দুটো এক করে মাথার ওপর তুলল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল হার্ডির আগুনে ঝলসানো কালো আঙুলগুলোর ওপর। আর্তনাদ করে উঠল হার্ডি, হ্যাচওয়ের কিনারা থেকে নিচের অগ্নিকুণ্ডে খসে পড়ল শরীরটা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গড়িয়ে গেমে গেল রানা

হেলিকপ্টারের গা থেকে।

সৈকতে নেমে দাঁড়াল, হাতে ব্রীফকেস, টলতে টলতে দূরে সরে আসছে। ত্রিশ ফুট আসার পরও শুনতে পাচ্ছে হার্ডির মরণ-চিৎকার, এই সময় বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাঙ্ক। শক ওয়েভের ধাক্কায় ছিটকে বালির ওপর পড়ে গেল ও, শরীরের নিচে চাপা পড়ল ব্রীফকেসটা।

আচ্ছন্ন বোধ করছে রানা, বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা বোল্ডারের মাঝখানে পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে অসুস্থ ভাবটা বাড়ছে, তাসত্ত্বেও মাথা তুলে চারদিকে তাকাল। সময়টা গোধূলি, দূর পাহাড়ের চূড়াতেও এখন আর রোদ লেগে নেই। আটলান্টিকের ঢেউ আছড়ে পড়ছে কাছাকাছি সৈকতে। হেলিকপ্টারটার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, এখনও সেটা দাউ দাউ করে জ্বলছে; আকাশে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার মোটা স্তম্ভ, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে নিরেট পাথরের তৈরি।

ঘুম পাচ্ছে রানার, চোখ দুটো খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। চোখ বুজল ও। একটা শব্দ ঢুকল কানে, ভাবল স্বপ্ন দেখছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। স্বপ্নে, কি জাগরণে বলতে পারবে না, চোখে তীব্র আলো লাগল। শব্দটা এখনও পাচ্ছে। ইচ্ছে করছে না, তবু চোখ খুলতে চেষ্টা করল। খুলতেই ধাঁধিয়ে গেল, আপনা থেকেই বুজে গেল আবার।

একটু পর সরে গেল আলোটা। আবার চোখ খুলল রানা। সাদা আলোর একটা বৃত্ত সরে যাচ্ছে সৈকত ধরে। প্রায় একশো ফুট দূরে ধীরে ধীরে বালির ওপর ল্যান্ড করছে একটা হেলিকপ্টার।

এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেল। এক পাশে সরে গেল হ্যাচ। সৈকতে নামল একজন, টর্চ জ্বেলে আরেকজনকে নামতে সাহায্য

করছে। টর্চের আলোয় ফিউজিলাজে আইরিশ নেভীর প্রতীক চিহ্ন দেখতে পেল রানা। আবার চোখ দুটো বুজে এল ওর। এবার সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ছে।

'স্যার! উঠুন, স্যার! আমরা পৌঁছে গেছি!'

চোখ খুলে রানা দেখল একটা প্রাইভেট কারের ব্যাকসীটে শুয়ে রয়েছে ও, মাথার নিচে ব্রীফকেস। ওর কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে ঝাঁকাচ্ছে ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার। হাত তুলে বাইরেটা দেখাল সে। সেদিকে তাকিয়ে আইরিশ কাস্টমস হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংটা দেখতে পেল রানা। 'আমি তাহলে ডাবলিনে?' বিড়বিড় করল ও, দরজা খুলে নেমে পড়ল ফুটপাথে।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার মুখে একজন পুলিস বাধা দিল, 'দুঃখিত, স্যার, কিন্তু ভেতরে ঢোকার অনুমতি...' রানার ক্ষত-বিক্ষত চেহারা দেখে থেমে গেল সে। 'মাফ করবেন, স্যার, আপনি তো আহত! এখুনি আপনাকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার...'

'থামো!' ধমক দিল রানা। 'তোমাদের এই অপারেশনের ইনচার্জ কে? ডাকো তাকে!'

'মি. রানা! মি. রানা!' বিল্ডিঙের কমপাউন্ড ধরে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুটে আসতে দেখা গেল আইএনসিসি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার উলরিখ বাউচারকে। পিছু নিয়ে আসছেন স্যুট পরা এক ভদ্রলোক। 'ওহ্ গড, এ কি চেহারা হয়েছে আপনার! স্যার, মি. রানা, গত তিন দিন আপনি ছিলেন কোথায়?' ছুটে এসে রানার কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন তিনি এক হাতে, অপরহাতে ব্রীফকেসটা। 'আপনার কষ্ট হচ্ছে, এটা আমাকে দিন, স্যার।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকছে। 'ফরহাদ কোথায়? স্বাতী?'

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে আশপাশে আর কে আছে দেখে নিলেন বাউচার, তারপর ফিসফিস করলেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জ্যাক ফেরির অফিসে চলুন, ওখানে বসে সব কথা বলছি।' পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। 'চীফ ইন্সপেক্টর রুবেন, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন, প্লীজ।'

জ্যাক ফেরির আউটার অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডেস্কে বসে থাকতে দেখল রানা, দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে। ইনার অফিসের দরজায় একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। সাদা পোশাক পরা কয়েকজন অফিসার জ্যাক ফেরির ডেস্কের নোট বুক, খাতা ও ফাইল-পত্র পরীক্ষা করছে। কনফারেন্স টেবিলে প্রচুর কাগজ-পত্র জড়ো করা হয়েছে, একজন ক্যামেরাম্যান সেগুলোর ফটো তুলতে ব্যস্ত।

'ফেরি তাহলে পালিয়েছে,' বলল রানা। 'কখন?'

'সব বলছি,' রানাকে ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন বাউচার। 'তার আগে ডাবলিন ডিটেকটিভ পুলিসের চীফ ইন্সপেক্টর টমাস রুবেনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইন্সপেক্টর রুবেন, ইনিই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম, রানা এজেন্সির চীফ–মাসুদ রানা।'

হ্যান্ডশেক করার সময় রানা জানতে চাইল, 'আপনি এখানে কখন পৌঁছেছেন, ইন্সপেক্টর?'

হাতঘড়ি দেখলেন ইন্সপেক্টর রুবেন। 'কাল রাত সাড়ে ছ'টার সময়। নেভীর হেলিকপ্টার সেভেন হগস-এর একটা দ্বীপ থেকে আপনাকে তুলে নিয়েছে, এই খবর পাবার পনেরো মিনিট পর। এসে শুনি, মি. ফেরি সকাল এগারোটার দিকে অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে গেছেন, সেক্রেটারিকে বলে গেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জরুরী একটা মীটিঙে যাচ্ছেন। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেছে,

সেখানে তিনি যাননি।

'এগারোটার সময় পালিয়েছে?' হতাশ দেখাল রানাকে। 'তারমানে আপনি পৌঁছুবার সাত ঘণ্টা আগে।' বাউচারের দিকে তাকাল ও। 'আমার অফিসাররা কোথায়?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, মি. রানা,' বললেন বাউচার। কি ঘটেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। আইরিশ কাস্টমস তো বটেই, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও রানাকে আয়ারল্যান্ডে অপারেশন চালাবার অনুমতি দেয়নি, অন্যান্য আরও অনেক দুঃসংবাদের সঙ্গে এ-খবর ডোনার কাছ থেকে পাবার পর ফরহাদ আর স্বাতী রানা এজেন্সির বারোজন এজেন্টকে নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আয়ারল্যান্ডে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেয়, উদ্দেশ্য ছিল রানার নিরাপত্তা বিধান ও সিন্ডিকেট কর্মকর্তাদের পরিচয় ফাঁস করে দেয়া। লন্ডনের আইরিশ কনসুলেট ভিসা দেয়নি, কারণ হিসেবে জানিয়ে দেয় প্রাইভেট কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে আয়ারল্যান্ডে কাজ করতে দেয়ার নিয়ম নেই। কাজেই বাউচার ওদের সবাইকে আইএনসিসি-র অফিসার হিসেবে নিয়োগ-পত্র দেন, সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়েন আয়ারল্যান্ডে। রানা এজেন্সির বারোজন এজেন্ট আইরিশ ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের একদল অফিসারের সঙ্গে গোস্ট ভ্যালী ভিনিয়ার্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়, স্বাতীকে নিয়ে ফরহাদ ঢোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। ভেতরে ঢুকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায় ওরা, কিন্তু তিনি অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান। ওদেরকেও মন্ত্রণালয় থেকে বেরুতে দেয়া হয়নি, সচিবের নির্দেশে আর্মড পুলিস ডেকে অ্যারেস্ট করা হয়। খবর পেয়ে সরাসরি আইরিশ প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেন বাউচার, তাঁর হস্তক্ষেপে আর্মড পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ফরহাদ আর স্বাতীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পথেই আছে তারা, যে-কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসবে।

'ব্রীফকেসটা খুলুন,' ইন্সপেক্টর রুবেনকে বলল রানা। 'ভেতরে একটা টেপ-রেকর্ডার আর ক্যাসেট পাবেন। ওটা চালু করলেই জানতে পারবেন সিন্ডিকেটের সঙ্গে কে কে জড়িত। তার আগে আমি দুটো নাম বলছি, ভুল হলে শুধরে দিন।'

'জ্বী, স্যার,' সাগ্রহে গলা লম্বা করলেন ইন্সপেক্টর।

'এইচ.সি. লুটন,' বলল রানা। 'এর মানে কি হোম সেক্রেটারি রবার্ট লুটন?'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল ইন্সপেক্টর রুবেনের। 'জ্বী, স্যার–আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম রবার্ট লুটন।'

'এখুনি পুলিস পাঠিয়ে অ্যারেস্ট করুন তাঁকে,' বলল রানা। 'আরেকটা নাম বলছি। এম.জি. ফাইবার। ইনি কে? মানে, কে হতে পারেন?'

সম্ভব নয়, তবু যেন ইন্সপেক্টরের চোখ আরও একটু বড় হলো। 'মাইকেল ফাইবার তো, স্যার, আমাদের প্রতিরক্ষা সচিব–উনি মেজর জেনারেল, তবে অবসরপ্রাপ্ত।'

'তাহলে তাঁকেও অ্যারেস্ট করুন,' বলল রানা। 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকেও ইন্টারোগেট করা দরকার, জানা দরকার কেন বা কার নির্দেশে তিনি ফরহাদ আর স্বাতীকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন।'

ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন চীফ ইন্সপেক্টর; নির্দেশ দিচ্ছেন গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে কোথায় কোথায় যেতে হবে, কাকে কাকে অ্যারেস্ট করতে হবে।

বাউচার এক হাতের তালুতে অপর হাতে ঘুসি মারছেন। 'এরা সবাই সিন্ডিকেটের লোক, এ তথ্য মি. ফরহাদও জানেন, স্যার। কিভাবে বা কোত্থেকে জেনেছেন, আমাকে বলেননি।'

'আমি জানি কোত্থেকে কিভাবে জেনেছে, তবে সে প্রসঙ্গ এখন

থাক,' বলল রানা। 'এরা বা আর যারা জড়িত তারা সবাই নেপথ্যে ছিল। তাদের পক্ষ থেকে সিন্ডিকেটটা পরিচালনা করছিল জ্যাক ফেরি। তাকে কোনভাবেই পালাতে দেয়া যাবে না।' চীফ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল রানা। 'মি. রুবেন, আমি জ্যাক ফেরির প্রাইভেট সেক্রেটারিকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

মেয়েটাকে জেরা করে জানা গেল, অফিস বিল্ডিং ত্যাগ করে চলে যাবার দশ মিনিট আগে লন্ডন থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছিল জ্যাক ফেরি।

উলরিখ বাউচার আর চীফ ইন্সপেক্টরকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল রানা। সিন্ডিকেটের একটা ট্রাক গতকাল সকাল দশটার দিকে হাইজ্যাক করে ও। ফেরি লন্ডন থেকে ফোন পায় এক ঘণ্টা পর। কে তাকে সাবধান করে দেয়? ট্রাকটার গন্তব্য ছিল কর্ক, সেটা চেক পয়েন্টগুলোকে পাশ না কাটানোয় সিন্ডিকেটের লোকেরা যা বোঝার বুঝে নেয়। ওকে খুঁজতে শুরু করে তারা, বিকেলের দিকে পেয়েও যায়।

চীফ ইন্সপেক্টর তাঁর একজন অফিসারকে ডেকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে খবর নিতে বললেন–জানতে হবে লন্ডনের কোত্থেকে ফোনটা করা হয়েছিল, কে-ই বা করেছিল। তারপর খাতা পেন্সিল নিয়ে রানার সামনে বসলেন তিনি, নোট নিচ্ছেন। রানা বলে যাচ্ছে–গ্রামের নাম নিউমার্কেট, কর্কের দিকে যাবার পথে, পাঁচ মাইল দূরে কাঠের একটা ব্রিজ আছে, নদীর তলায় পাওয়া যাবে হেরোইন ভর্তি ট্রেইলর...

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা, বাউচারের দিকে ফিরে বলল, 'ফেরির বোটটা ম্যারিনায় আছে কিনা খোঁজ নেয়া হয়েছে?'

'বোট!' আকাশ থেকে পড়লেন বাউচার।

'গ্রেইস্টোনস-এ ফেরির একটা কেবিন ক্রুজার আছে, চল্লিশ ফুট লম্বা।'

'চল্লিশ ফুট লম্বা!' ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে আঁতকে উঠলেন চীফ ইন্সপেক্টর। 'অত বড় বোট নিয়ে তিনি তো যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারেন।'

'তবে আর বলছি কি! তার হাতে যে সময় ছিল, গ্রেইস্টোনস-এ পৌঁছুবার জন্যে প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা হাতে পেয়েছে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'বোটটা এখন যেখানেই থাকুক, একা শুধু ফেরিকে নয়, তার দুই বান্ধবীকেও গ্রেফতার করতে হবে। তারা জড়িত কিনা আমি জানি না, তবে জেরা করলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। মিরিন্ডা জোনস আর পলা বারবি, দু'জনেই অভিনেত্রী।' চীফ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল ও। 'আপনার লোকদের বলে যান, আমার অফিসাররা, মি. ফরহাদ ও মিস স্বাতী; এখানেই যেন থাকেন। বলতে হবে, আমাদের সমস্ত এজেন্টকে ডাবলিনে ডেকে নেবে ওরা।'

'ইয়েস, মি. রানা,' ইন্টারকমে নিজের লোকদের নির্দেশ দিতে শুরু করলেন চীফ ইন্সপেক্টর।

গ্রেইস্টোনস ম্যারিনায় পৌঁছে দেখা গেল ফেরির বোট নেই। দুই গাড়ি ভর্তি পুলিস দেখে ঘাবড়ে গেল কেয়ারটেকার লোকটা, প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে ঢোক গিলছে। না, মি. ফেরি বোট নিয়ে কোথায় গেছেন বলে যাননি। না, তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না। হ্যাঁ, কাল বিকেলে রওনা হয়েছেন তিনি।

পুলিস কারে ফিরে গিয়ে মাইক্রোফোনে কথা বলছেন চীফ ইন্সপেক্টর।

একটা ডেক চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন বাউচার। 'মি. রানা, আপনার বন্ধু কোথায় যেতে পারেন? আন্দাজ করতে পারেন?'

'লন্ডনে,' নির্দ্বিধায় বলল রানা।

'লন্ডনে? কেন?'

'লন্ডনই একমাত্র শহর যেখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজ,' বলল রানা, মনের অন্য একটা সন্দেহের কথা প্রকাশ করল না। 'পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে সে, তারপর ইংল্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।'

'সেক্ষেত্রে বোট নিয়ে কেন গেলেন? প্লেন ধরলেই তো পারতেন।'

'কারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা তখনও সে পায়নি,' বলল রানা। 'শুধু জানত আমি সিন্ডিকেটের একটা লরি হাইজ্যাক করেছি। সে জানত না তার লোকজন আমাকে ধরতে পারবে। তাছাড়া, প্লেনে উঠলে ট্রেস করা সহজ।' লরির গ্লাভ বক্স থেকে পাওয়া ম্যাপটা বের করল ও। ম্যাপে উত্তর উপকূল রেখা দেখানো হয়েছে, ডাবলিন থেকে গলওয়ে পর্যন্ত। আইরিশ চ্যানেলের ওপর ফেরি রুটটাও চিহ্নিত করা আছে, সময়ের হিসাব সহ—সাত ঘণ্টা। 'দেখুন, কাল বিকেল তিনটের দিকে রওনা হয়েছে ফেরি, তারমানে মাঝরাতের দিকে পৌঁছেছে হোলিহেড-এ, ফেরির চেয়ে বোটের স্পীড একটু যদি কম ধরি।'

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ম্যাপটার দিকে তাকালেন বাউচার। মাথা নেড়ে বললেন, 'হোলিহেড নয়, ক্ল্যানডাডনোর দিকে যাবেন তিনি, অন্তত আমার তাই ধারণা। রিভার হারবার সহ বেশ বড় শহর ক্ল্যানডাডনো, কোন কাস্টমসের ঝামেলা নেই—বোট ছেড়ে একটা কার নিয়ে লন্ডনের দিকে যাওয়া খুব সহজ।'

'সম্ভব,' বলল রানা। 'তাতে তার তিন থেকে চার ঘণ্টা বেশি সময় লাগবে। এখন সোয়া ন'টা বাজে। ওখানে সে পৌঁছেছে, এই সকাল, আজ বিকেল তিনটে কি চারটের সময়। তারমানে আমাদের চেয়ে ঘণ্টা ছয়েক এগিয়ে আছে।'

'চলুন দেখি কি করা যায়,' রানাকে নিয়ে পুলিস কারের দিকে

এগোলেন বাউচার।

মাইক্রোফোনে কথা বলছিলেন চীফ ইন্সপেক্টর। সেটা রেখে দিয়ে রানাকে বললেন, 'আপনার লন্ডন শাখার প্রধান মি. ফরহাদের সঙ্গে কথা হলো। তিনি আপনাকে রিপোর্ট করেছেন, আমি সব লিখে রেখেছি,' নোটবুকের একটা কাগজ ছিঁড়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

ফরহাদ জানিয়েছে, ট্রলার মাস্টার গুচম্যান কোপেনহেগেনের রাস্তায় অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলিতে মারা গেছে। তার সলিসিটর ফন অটারম্যানকে ইন্টারোগেট করা হয়, তিনি সিন্ডিকেটের কাছ থেকে মাসোহারা পাবার কথা স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, গুচম্যান যাতে জামিন পায় সেজন্যে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারককে ঘুষ দেয়ার কথাও স্বীকার গেছেন তিনি। কোপেনহেগেনের সিআইডি পুলিস দু'জনকেই গ্রেফতার করেছে। পুলিস অফিসার মার্কাস উলফকেও ইন্টারোগেট করে সিআইডি অফিসাররা। তার প্রসঙ্গে ফরহাদ জানিয়েছে, 'মাসুদ ভাই, উলফ স্বীকার করেছে ঋজুর নাম টেলিফোনে জানানো হয় তাকে, লন্ডন থেকে। এমনকি লন্ডন থেকে ঋজুর নামে যে হিলটনের কামরা বুক করা হয়েছিল, এই তথ্যও সে জানত।' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিসিআই চীফ রাহাত খানের বিশেষ অনুরোধে ইরানের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ আজমল আফসানজানি ওদের একজন কর্নেলের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেন। এই কর্নেল বেলালী ইয়াজদানীর ওপর দায়িত্ব ছিল জিলান ডিস্ট্রিক্টে পাওয়া পাতা ও পাপড়িবিহীন পপি গাছের চারা ও ফলের নমুনা লন্ডনে পাঠাবেন। কিন্তু তা তিনি পাঠাননি। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মিলিটারি পুলিস ইন্টারোগেট করায় নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন তিনি–সিন্ডিকেটের কাছ থেকে মোটা টাকা মাসোহারা পাচ্ছিলেন। দীর্ঘ রিপোর্ট, আরও অনেক তথ্য দিয়েছে ফরহাদ।

*

চার্টার করা পাইপার কোমাঞ্চি ক্ল্যানডাডনোর কাছাকাছি ছোট্ট একটা এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করল। সারাটা পথ সীটে বসে ঘুমালেও বাউচারের পিছু নিয়ে প্লেন থেকে নামার সময় টলছে রানা, শরীরের ক্লান্তি কমা তো দূরের কথা, আরও যেন বেড়ে গেছে। সকালের রোদে ধাঁধিয়ে গেল চোখ, রানওয়ের পাশে অপেক্ষারত পুলিস কারে উঠল ওরা। বাউচার ড্রাইভারকে প্রশ্ন করছেন, স্থানীয় পুলিস ডিপার্টমেন্টের একজন কন্সটেবল সে।

জানা গেল, ক্ল্যানডাডনো হারবারে জ্যাক ফেরির বোটটা পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু বোটে কেউ নেই। খুব ভোরে নোঙর ফেলে, কেউ ফেরিকে নামতে বা চলে যেতে দেখেনি। বাউচার জানতে চাইলেন, 'কার রেন্টাল এজেন্সিগুলোয় খোঁজ করা হয়েছে?'

শুধু কার রেন্টাল এজেন্সি নয়, পেট্রল স্টেশনগুলোতেও খোঁজ করা হয়েছে, কিন্তু জ্যাক ফেরির চেহারার সঙ্গে মেলে এমন কারও কথা কেউ স্মরণ করতে পারছে না।

শহরে ঢুকে পুলিস স্টেশনের সামনে গাড়ি থামাল লোকটা। ভেতরে ঢুকে একটা টেলিফোনের দিকে এগোল রানা। 'ডোনার সঙ্গে কথা বলা দরকার,' বাউচারকে বলল ও।

হঠাৎ রানার পথ আগলে দাঁড়ালেন বাউচার। 'স্যার, এখন বোধহয় মিস ডোনাকে ফোন না করাটাই উচিত। আপনি বরং লন্ডনে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

টকটকে লাল চোখ তুলে তাকাল রানা। 'কেন?'

'কারণ, স্যার, মিস ডোনার ধারণা, আপনি নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার।'

'কি বলতে চান?' রানা সম্পূর্ণ শান্ত।

কন্সটেবলকে ডেকে দু'কাপ কফি দিতে বললেন বাউচার।

তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'চারদিন আগে লন্ডন ত্যাগ করার পর কোথায় গেছেন, কি করেছেন, সব আমাকে বলুন, প্লীজ, মি. রানা,' অনুরোধ করলেন তিনি।

কি কি ঘটেছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল রানা। ও থামতে বাউচার বললেন, 'তারমানে মিস ডোনাকে আপনি দু'দিন আগে নির্দেশ দেন আমাকে সব কথা বলার, তাই তো?'

'হ্যাঁ। বলেনি সে?'

মাথা নাড়লেন বাউচার। 'মি. রানা, স্যার, সত্যি আমি দুঃখিত। মিস ডোনা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন ঠিকই, তবে গতকাল। তাও লাঞ্চের ঠিক আগে। বলেছেনও অন্যভাবে।'

'অন্যভাবে কিভাবে?'

'মিস ডোনা বললেন, আপনি আয়ারল্যান্ডে গেছেন। এ তো আমি জানতামই, কাজেই নতুন কোন তথ্য নয়। তারপর বললেন, আয়ারল্যান্ডের ছোট্ট একটা শহর থেকে তাঁকে আপনি ফোন করেছেন; কিন্তু শহরটার নাম তিনি মনে করতে পারছেন না। সাংঘাতিক আপসেট লাগছিল তাঁকে। তাঁর ভাষায়, আপনার কথা শুনে মনে হয়েছে আপনি প্রলাপ বকছেন, অর্থাৎ আপনার সব কথা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেননি...'

রানা কিছু বলছে না।

'মি. রানা, আপনার জন্যে দুশ্চিন্তায় এত অস্থির দেখি তাঁকে, একেবারে পাগলিনীর মত লাগছিল। বারবার বলছিলেন, আপনি নার্ভাস ব্রেকডাউনে আক্রান্ত হয়েছেন, পাগল হয়ে যেতে পারেন।'

'এ-সব ডোনা কাল আপনাকে বলেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'বলেনি আমি ফিল্ম আর পপির দুটো নমুনা পাঠাচ্ছি?'

'না। শুনুন, মি. রানা, মিস ডোনা আমাকে বলেছেন ফোনে আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর মনে

হয়েছে হয় আপনি প্রলাপ বকছিলেন, নয়তো লাইনটা এত খারাপ ছিল যে আপনার কথা পরিষ্কার শোনা যায়নি...'

কামরার এক প্রান্ত থেকে ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করল কন্সটেবল। 'স্যার, এসো গ্যারেজ থেকে এক ভদ্রলোক পেট্রল নিয়েছেন–চেহারার বর্ণনা মিলে যায়। গ্যারেজটা ক্ল্যানডাডনো জাংশনের দক্ষিণে। আজ ভোর পাঁচটার ঘটনা। গাড়িটা নীল একটা অস্টিন। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা আছেন।'

দেয়ালে সাঁটা ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'লন্ডনে পৌঁছুতে হলে ক্ল্যানডাডনোর দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে যেতে হবে তাকে।' আপনমনে মাথা নাড়ল, ফিরল পাশে দাঁড়ানো বাউচারের দিকে। 'ব্যাপারটার মধ্যে বোধহয় একটা চালাকি আছে, মি. বাউচার। ফেরি যেন আমাদের কাজ সহজ করে দিচ্ছে। পরিষ্কার একটা ট্রেইল রেখে যাচ্ছে সে। যেন চাইছে আমরা তাকে অনুসরণ করি।'

রানার বক্তব্য বুঝতে না পেরে চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন বাউচার।

কন্সটেবলের দিকে তাকাল রানা। 'যে লোক পালাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছে, পেট্রল নেয়ার জন্যে রাস্তায় কেন থামবে সে? রওনা হবার সময়ই তো ট্যাংক ভরে নেবে। তুমি চেক করে দেখো তো, কতটুকু পেট্রল নিয়েছে।'

'জ্বী, স্যার,' বলে ফোনের দিকে হাত বাড়াল কন্সটেবল।

বাউচারকে রানা বলল, 'ফেরি হয়তো চাইছে নীল অস্টিনের খোঁজে দক্ষিণ দিকে ছুটি আমরা, কিংবা রোডব্লকগুলো থেকে খবর পাবার অপেক্ষায় থাকি।'

'এই ফাঁকে কি করবেন তিনি?'

'ম্যাপে দেখানো হয়নি এমন অনেক পাহাড়ী পথ আছে দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভেড়ার পাল আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। ওগুলো

শুধু অর্ডন্যান্স ম্যাপে পাওয়া যাবে।'

ফোন রেখে ওদের দিকে এগিয়ে এল কন্সটেবল। 'স্যার, ভদ্রলোক দুই গ্যালন পেট্রল নিয়েছেন ট্যাংকে, অতিরিক্ত এক গ্যালন নিয়েছেন একটা টিনে।'

দশ মিনিটের মধ্যে একটা কোয়ার্টার-ইঞ্চ অর্ডন্যান্স ম্যাপ যোগাড় করা সম্ভব হলো। লিভারপুল পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও করতে পারলেন বাউচার। সার্চ প্যাটার্নটা কেমন হবে ম্যাপ দেখে জানিয়ে দিল রানা। 'সময়ের হিসেবে আমাদের চেয়ে চার ঘণ্টা এগিয়ে আছে সে,' বলল ও। 'শহরের দক্ষিণ আর পুব দিকের সব ক'টা রোড ব্লককে পাশ কাটিয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত ওয়েলস-এও নেই সে।'

ওর সঙ্গে একমত হয়ে ম্যানচেস্টার থেকে গ্লস্টার পর্যন্ত সমস্ত এ ও বি রোডে রোড-ব্লক খাড়া করার ব্যবস্থা করলেন বাউচার।

কার রেন্টাল এজেন্সি থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করল ওরা, রওনা হলো লন্ডনের দিকে। দশ মিনিটের মধ্যে ব্যাক সীটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। বাউচার গাড়ি চালাচ্ছেন। ওয়েলস ছেড়ে বেরুবার আগে গাড়ি থামিয়ে ক্ল্যানডাডনো পুলিস স্টেশনে দু'বার ফোন করলেন তিনি। প্রথম দু'ঘণ্টা সার্চ করে নীল অস্টিনকে খুঁজে পায়নি হেলিকপ্টার।

ডাবলিনে ফোন করে জানা গেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা সচিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জনেই পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে প্লেনে চড়ে লন্ডনে ফিরে গেছে স্বাতী ও ফরহাদ, তাদের সঙ্গেও কথা বললেন বাউচার।

সাড়ে দশটার দিকে বারমিংহাম-এ পৌঁছুল ওরা। আকাশে মেঘ জমছে, আবহাওয়ার খবরে বলা হলো বিকেলের দিকে ঝড়

উঠতে পারে। ত্রিশ মিনিট আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, লন্ডন-মুখী রোড নেটওঅর্কে ফেরিকে দেখা যায়নি।

বারমিংহাম পুলিস হেড়কোয়ার্টারে পৌঁছুল ওরা। আগেই ফোন করা হয়েছিল, কন্সটেবল ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। পথ দেখিয়ে রানাকে একটা টয়লেটে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। গরম পানিতে শাওয়ার সেরে নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরল রানা, রেডিমেড গার্মেন্টিস-এর দোকান থেকে খানিক আগে কিনে আনা হয়েছে। ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করা হলো হেড কন্সটেবল-এর অফিস কামরায়। পুলিস বিভাগের একজন ডাক্তার এলেন, আলাদা একটা কামরায় নিয়ে গিয়ে রানাকে তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'স্যার, আমার পরামর্শ এখুনি আপনি হসপিটালে ভর্তি হন।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'কাল, ডাক্তার, কাল। আজ আমার একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করার দিন।'

অসহায় দেখাল ডাক্তারকে, ইঙ্গিতে নার্সকে কাছে ডাকলেন। রানার জখমগুলোয় অ্যান্টিসেপটিক অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিল সে। ভাঙা পাঁজরের হাড় জায়গামত বসিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হলো। আবার কাপড়চোপড় পরছে, ভেতরে ঢুকে বাউচার জিজ্ঞেস করলেন, 'রওনা হতে পারবেন, স্যার?'

'কোথায় যেতে হবে?'

'এখান থেকে ষাট মাইল দূরে জ্যাক ফেরির অস্টিনকে দেখা গেছে, সাইরেনস্টার-এ।'

'শুধু গাড়ি? তাকে কেউ দেখেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিপোর্টটা অসমাপ্ত, স্যার,' বললেন বাউচার। 'ক্যাথেড্রাল-এর সামনে পার্ক করা অবস্থায় দেখা গেছে গাড়িটা–শহরের মাঝখানে ওটা।'

'ঠিক আছে, চলুন,' বলল রানা।

*

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যে সাইরেনস্টার পুলিস স্টেশনে পৌঁছুল ওরা। নীল অস্টিনটাকে আগেই পুলিস স্টেশনের কার পার্কে নিয়ে আসা হয়েছে। ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট টীম-এর লোকেরা রিপোর্ট করল, গাড়িটায় কোন হাতের ছাপই পাওয়া যায়নি–না কোন পুরুষের, না কোন মহিলার।

নিশ্চিত হওয়া গেল, এই গাড়িতে চড়েই সারেনসেস্টারে পৌঁছেছে ফেরি, তা না হলে আঙুলের ছাপ মুছে ফেলা হবে কেন। প্রশ্ন হলো, এখান থেকে মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় গেছে সে। রেলওয়ে স্টেশনে? না, কারণ অস্টিন শহরে পৌঁছানোর দু'ঘণ্টা আগেই শেষ ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে। কাছাকাছি এয়ারপোর্ট অক্সফোর্ডে, ওদিকে গেলে রোড ব্লকে ফেরি ধরা পড়ে যেত। তারপর খবর এল, স্থানীয় কোন হোটেলেও ওঠেনি সে। লোকাল বাস সার্ভিসের রুট ম্যাপ চাইল রানা।

ম্যাপ পেতে দুপুর একটা বেজে গেল। তাতে দেখা গেল একটা লোকাল সার্ভিস টেমস নদী পর্যন্ত আসা-যাওয়া করে। ওদিকে একটা ডকও আছে। 'আসুন,' বলে পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা।

ট্র্যাফিক আইন মানছে না রানা,আশি মাইল স্পীডে ডকে পৌঁছুতে সাত মিনিট লাগল। পকেট থেকে আগেই নিজের পরিচয়-পত্র বের করে রেখেছেন বাউচার, ট্র্যাফিক কন্সটেবলকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'টেমসে বেড়াবার জন্যে বোট ভাড়া করতে চাই, কোথায় গেলে পাব?'

'রাস্তার শেষ মাথায় হলুদ রঙের একটা বাড়ি পাবেন, ডকের ডান পাশে...'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। হলুদ বাড়িটার সামনে ব্রেক কষে থামল। একতলা বাড়ির গেট খুলে প্রৌঢ় এক লোক বেরিয়ে এল।

'কি ব্যাপার?'

'আজ সকালে এক লোক আপনার একটা বোট ভাড়া করেছে, সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল,' গাড়ি থেকে নেমে বলল রানা। 'সঠিক সময়টা জানতে চাই আমরা।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'কেন আমি...'

'আমরা পুলিসের লোক,' বলে নিজের পরিচয়-পত্রটা দেখালেন বাউচার, গাড়ি থেকে নামেননি তিনি।

'আগে বলবেন তো!' নার্ভাস হাসি দেখা দিল প্রৌঢ়ের মুখে। 'ওরা বোট নিয়েছেন দশটার দিকে। বললেন, অক্সফোর্ড থেকে বেড়িয়ে আসবেন। ফিরবেন চারদিন পর। নগদ টাকায় ভাড়া মিটিয়েছেন।'

'দশটায়...চার ঘণ্টা এগিয়ে আছে,' বিড়বিড় করল রানা, বোট মালিকের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কেমন দেখতে তারা?'

লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'আপনার মতই লম্বা ভদ্রলোক তবে অনেক মোটা। গোঁফ আছে। বিজনেস স্যুট পরে আছেন। মেয়েটার পরনে স্ল্যাকস আর রেইনকোট। রেইনকোট দিয়ে মাথা ঢাকা, চেহারা দেখতে পাইনি। স্পাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আপনি ঠিক জানেন, ওরা হেঁটে এসেছিল এখানে?'

'নিজের চোখেই তো দেখলাম হেঁটে এলেন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'বোট নিয়ে অক্সফোর্ডে যেতে কতক্ষণ লাগবে আমার?'

'লকগুলো খোলা পেলে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। 'মি. বাউচার। আপনি গাড়ি নিয়ে অক্সফোর্ডে চলে যান, আমি যাই একটা বোট নিয়ে। তার আগে অক্সফোর্ড পুলিসকে ফোন করে রাস্তায় সার্চ পার্টি নামাতে বলুন। ঠিক আছে?'

'মি. রানা, নিজের অবস্থার কথা ভাবুন। আপনার হাসপাতালে থাকা উচিত, স্যার...'

'পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেছে, আর কয়েক জায়গার চামড়া উঠে গেছে, কাজেই আমি মারা যাচ্ছি না,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'ফেরিকে আমার চাই, মি. বাউচার। সে শুধু আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, আমার প্রিয় ছোটভাইকে খুন করেছে। সোজা কথায়, প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।'

বাউচার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রানা বাধা দিল, 'প্লীজ, কথা বাড়িয়ে দেরি করাবেন না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন বাউচার। 'সেক্ষেত্রে শুধু একটা কথাই বলব–সাবধানে থাকবেন, প্লীজ।' এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর জ্যাকেট থেকে নিজের অস্ত্রটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। 'এটা রাখুন।'

'ধন্যবাদ। লোড করা তো?' ওয়ালথার পি-থারটি এইটটা নেড়েচেড়ে দেখছে রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যামিউনিশন-এর অতিরিক্ত একটা ক্লিপও ধরিয়ে দিলেন বাউচার রানার হাতে।

'আমার একটা উপকার করবেন, যদি সময় পান?' বলল রানা। 'ডোনাকে ফোন করে জানাবেন, আমি ভালই আছি, এখনও পাগল হয়ে যাইনি। যা যা ঘটেছে সবই তাকে বলবেন।'

মাথা ঝাঁকালেন বাউচার। 'গুড লাক, মি. রানা।' রানা গাড়ি থেকে নামছে, আবার বললেন, 'অক্সফোর্ডে দেখা হচ্ছে আমাদের।'

নয়

ঝম-ঝম বৃষ্টির মধ্যে বিশ ফুটী কেবিন ক্রুজার নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। ডকের কিনারায় দাঁড়িয়ে বোটটাকে কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন উলরিখ বাউচার, আপনমনে মাথা নাড়ছেন।

প্রথম কয়েক ঘণ্টায় চারটে গ্রাম, পাঁচটা বোট ল্যান্ডিং আর টেমসে মিলিত হওয়া কয়েকটা খাল চেক করল রানা। কিন্তু না, ফেরির ভাড়া করা কেবিন ক্রুজার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

অক্সফোর্ড থেকে এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছে, এদিকে সময় গড়িয়ে শেষ বিকেলের দিকে পৌঁছে যাচ্ছে। চিমনি থেকে অক্সফোর্ডে ফোন করল রানা। বাউচারকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল ও-কুয়াশা খুব বেশি হওয়ায় নদীর দুই পাড় ভাল করে দেখা হয়নি ওর, পুলিস যেন বোট নিয়ে ওর ফেলে আসা পথটা ভাল করে চেক করে, বিশেষ করে খালের মুখগুলো।

তারপর আবার নিজের পথে বোট নিয়ে ছুটল রানা। ফারমূর রেজারভয়ার-এ পৌঁছে প্রথম একটা খুশির খবর পেল ও। ছোট একটা চায়ের দোকানে দেখা হলো অ্যাটেনড্যান্ট-এর সঙ্গে। নীল আর সাদা একটা বোটের কথা মনে করতে পারল সে, বোট থেকে নেমে স্যান্ডউইচ কেনে এক লোক। বোটে একটা মেয়েও ছিল,

তবে ডাঙায় নামেনি, চোখে বিনকিউলার তুলে গোটা এলাকার ওপর চোখ বুলাচ্ছিল। এই বেলা দেড়টার সময় আর কি।

জেটির শেষ মাথায় টেলিফোন, সেদিকে ছুটল রানা। যোগাযোগ ঘটতে বাউচারই প্রথমে রিপোর্ট করলেন—না, ফেরির বোট অক্সফোর্ড পার হয়নি। রানা জানাল, 'হয় সে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, তা না হলে ব্যারিয়ার খাড়া করার আগেই অক্সফোর্ডে পৌঁছেছে।' হঠাৎ আরেকটা সম্ভাবনার কথা মাথায় খেলল। 'কিংবা সামনে বিপদ আছে বুঝতে পেরে ফেলে আসা পথেও ফিরে যেতে পারে।'

'আপনি তাহলে এখন কি করতে বলেন, মি. রানা?' জানতে চাইলেন বাউচার।

'অক্সফোর্ডে ব্যারিয়ার থাকুক, তবে ভাটির দিকেও রিভার পুলিসকে টহল দিতে বলুন—একেবারে সেই রিডিং পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন বাউচার।

এক ঘণ্টা পর অক্সফোর্ডে পৌঁছুল রানা। প্রথম ব্যারিয়ার পেরিয়ে উঠে এল শহরের দক্ষিণে, এ/ফোর-ওয়ান-ফোর-ওয়ান ওভারপাস-এ। এখানে একটা রোডব্লকে দু'জন পুলিস অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করছেন উলরিখ বাউচার। রানাকে রিপোর্ট করলেন তিনি। না, কোথাও ফেরিকে দেখা যায়নি। রানা ফোন করার পাঁচ মিনিট পর একটা পুলিস লঞ্চ ভাটির দিকে রওনা হয়, ক্লিফটন হ্যাম্পডেন পৌঁছেছে সেটা। নদীর পাশের সবগুলো রাস্তায় রোডব্লক খাড়া করা হয়েছে, এখান থেকে সেই লন্ডন পর্যন্ত।

বাউচার আরও জানালেন, দক্ষিণ ইংল্যান্ডের প্রায় গোটা পুলিস ফোর্সকে ফিল্ডে নামানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রানা এজেন্সির এজেন্টরাও, আয়ারল্যান্ড থেকে ফেরার পর ফরহাদ তাদেরকে দম ফেলারও ফুরসত দেয়নি। সবশেষে জানালেন, 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলোও সার্চ সম্পর্কে

খবর রাখছেন, স্যার।'

'আবার যোগাযোগ করলে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন,' বলল রানা। 'শুনুন, মি. বাউচার, আইএনসিসি-র অ্যাকটিং কমিশনার হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাহায্যও আপনি চাইতে পারেন, সে আইনগত ক্ষমতা বা অধিকার আপনার আছে। প্রয়োজন হলে তা-ও আপনাকে চাইতে হতে পারে।'

বাউচার গম্ভীর, শুধু মাথা ঝাঁকালেন একবার।

নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'ডোনা গোটা ব্যাপারটাকে কিভাবে নিচ্ছে?' নিচু গলায় জানতে চাইল ও। 'তার কি এখনও ধারণা যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

বাউচারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'বলতে পারব না, মি. রানা। মিস ডোনা আজ অফিস করেননি। একজন ক্লার্ক বলল, কাল নাকি তিনি আপনার খোঁজে আয়ারল্যান্ডে যাবার কথা বলছিলেন। কে জানে, হয়তো কাল রাতেই ইংল্যান্ড ত্যাগ করেছেন।'

'ও, আচ্ছা,' বলে ঢাল বেয়ে বোটের দিকে নামতে শুরু করল রানা।

'আমরা রিডিং-এর দিকে যাচ্ছি, মি. রানা,' চিৎকার করে বললেন বাউচার। 'আপনি?'

'ওখানেই আবার দেখা হবে,' বোট থেকে পাল্টা চিৎকার করল রানা।

পুলিস অফিসারদের নিয়ে রোডব্লকের দিকে এগোলেন বাউচার, একটা কার-এ উঠলেন।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। প্রাচীন স্যাক্সন শহর অ্যাবিংডন-এর পাশে পৌঁছে রানা দেখল নদীটা দুটো চ্যানেলে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। সম্ভবত দৃষ্টিসীমা কম হওয়াতেই বাম দিকের বদলে ডান দিকের চ্যানেলে ঢুকে পড়ল ও। কিছু দূর

যাবার পরই সামনে ঝুলে থাকতে দেখল একটা ব্রিজ। চ্যানেলটা হঠাৎ সরু হয়ে এল, দু'দিকের পাথুরে পাঁচিল কাছে চলে আসছে। ক্রুজারের ব্রিজ থেকে পাঁচিলের ওপারে টেরেস সহ আলোকিত বাগান ও বাড়ি দেখতে পাচ্ছে রানা। হকচকিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বন্ধ করল থ্রটল, তারপর এঞ্জিন রিভার্স করে বোটের গতি কমিয়ে আনল, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে টেমস নদীতে নেই ও। ভুল পথে এলেও, মনের টানে সামনেই এগোচ্ছে, ব্রিজের তলা দিয়ে আরও খানিক দূর দেখে আসার ইচ্ছে। ব্রিজের ওপর দু'দিকেই খোলা পার্ক। পিছনে বা সামনে বোট ঘোরাবার জায়গাও নেই, কাজেই চাইলেও ভুলটা এখুনি শুধরে নিতে পারবে না।

ব্রিজ ছেড়ে কয়েকশো গজ পেরিয়ে এল রানা। শহরটা পিছিয়ে পড়ছে। তারপর নদী চওড়া হতে শুরু করল। নদীর একদিকের কিনারা থেকে মাটি কাটা হয়েছে, কাজেই বোট ঘোরাতে অসুবিধে হবে না। একশো আশি ডিগ্রী টার্ন নিচ্ছে রানা। নদীর কাটা অংশে সাদা ও নীল রঙের কেবিন ক্রুজারটা দেখতে পেল ও। সরাসরি একটা হাউজবোটের পিছনে নোঙর করা, দ্বিতীয়বার ওদিকে চোখ না পড়লে রানা দেখতেই পেত না।

পুরো বাঁক না ঘুরেই হাউজবোটের পাশে চলে এল বোট। হাউজবোট থেকে ছাতা মাথায় বেরিয়ে এল এক লোক। 'পুলিস,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। আঙুল তুলে কেবিন ক্রুজারটা দেখাল। 'এটা কখন ভিড়ল এখানে?'

'মিনিট দশ-বারো আগে,' বলল লোকটা। 'কেন?'

'কেন তা আপনার জানার দরকার নেই,' বলল রানা। 'কে ছিল বোটে? কেমন দেখতে তারা? ক'জন?'

'দু'জন। এক লোক, এক মেয়ে। বোট বেঁধে রেখে চলে গেল।'

'কিসে করে গেল?'

রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে পার্কিং লটটা দেখাল হাউজবোটের মালিক। 'কে রেখে গিয়েছিল জানি না, তবে ওখানে একটা গাড়ি ছিল, তাতে উঠে চলে গেল।'

'কি গাড়ি?' পার্কিং লটের দিকে তাকাল রানা, আর মাত্র একটা গাড়ি রয়েছে সেখানে।

'ভাল করে খেয়াল করিনি। দেখছেন না কেমন বৃষ্টি হচ্ছে। সম্ভবত একটা ক্যাপরি।'

'কাছাকাছি ফোন পাব কোথায়, বলতে পারেন?'

আবার রাস্তার দিকে হাত তুলল লোকটা। ছুটল রানা।

পকেটে খুচরো পয়সা নেই, বাধ্য হয়ে নাইননাইননাইন-এ ফোন করল ও। অক্সফোর্ড পুলিস ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে সতর্ক করা হয়েছে, কাজেই পরিস্থিতি সম্পর্কে সবই জানে ডিউটি অফিসার। নিজের পরিচয় দিয়ে রানা তাকে কয়েকটা নির্দেশ দিল। প্রথম কাজ, অ্যাবিংটনের চারধারের সবগুলো রোডব্লকে খবর পাঠাতে হবে একটা ক্যাপরিকে যেন থামানো হয়। গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা রঙ জানা নেই ওর, তবে একজন পুরুষ আর একটা মেয়ে আছে তাতে। রোডব্লকগুলোয় লোকটার চেহারার বর্ণনা আগেই পাঠানো হয়েছে। বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে এ/ফোরওয়ানফাইভ-এর ওপর, কারণ ওই রোড ধরে পশ্চিম দিকে গেছে ওরা, দশ থেকে পনেরো মিনিট আগে। দ্বিতীয় কাজ, ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক কন্ট্রোল কমিশনের অ্যাকটিং কমিশনারকে সতর্ক করতে হবে, রিডিং পুলিস স্টেশনের মাধ্যমে। তাকে বলতে হবে তিনি যেন এদিকে চলে আসেন।

ফোন বুদ থেকে বেরুচ্ছে রানা, দেখল রাস্তা পেরিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে হাউজবোটের মালিক। পার্কিং লটের দিকে হাত তুলে সাদা অস্টিনটা দেখিয়ে, জানতে চাইল, 'ওটা কি আপনার গাড়ি?'

'হ্যাঁ, না–আমার স্ত্রীর।'

'পুলিসকে সাহায্য করলে পুরস্কার পাওয়া যায়, জানেন তো?' হাসছে রানা। 'চাবিটা দিন, প্লীজ।'

লোকটা পিছাতে শুরু করল। 'আরে, কি বলেন! আমার স্ত্রীকে চেনেন না, গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে...'

'তবু ঝুঁকিটা আপনাকে নিতে হবে,' বলে পকেট থেকে পিস্তল বের করে লোকটার দিকে তাক করল রানা। 'তা না হলে, বুঝতেই পারছেন...'

পকেট থেকে চাবি বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। 'ওকে আমি কি বলব? সত্যি আপনি পুলিস কিনা...'

'অপেক্ষা করতে বলবেন,' জবাব দিল রানা, চাবি নিয়ে ছুটল গাড়ির দিকে। 'হয় গাড়ি ফিরে পাবেন, নয়তো ক্ষতিপূরণের টাকা।'

পার্কিং লট থেকে বেরিয়েই থার্ড গিয়ার দিল রানা, স্পীড মিটারের কাঁটা সত্তরের ঘরে পৌঁছে গেল। ভেজা রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে আছে, তবে ভাগ্য ভাল যে উল্টোদিক থেকে কোন গাড়ি আসছে না।

চৌরাস্তায় পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগল। রোড সাইনে লেখা রয়েছে এ/থ্রীথ্রীএইট। রাস্তা ছেড়ে ঘাস ঢাকা মাটিতে নেমে এল অস্টিন, এক লাইনে অপেক্ষারত গাড়িগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে। চৌরাস্তার চারটে রোডেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু গাড়ি, বৃষ্টির মধ্যে গিজগিজ করছে লোকজন। গাড়ি থামিয়ে নিচে নামল রানা, ভিড় ঠেলে সামনে এগোল। রোড জাংশন ব্লক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পুলিস জাগুয়ার, নীল আলো ফ্ল্যাশ করছে। ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে, লাল ফ্লেয়ারের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে মুখটা। কপালে কাটা দাগ, নাক থেকেও রক্ত ঝরছে। ইউনিফর্ম পরা দ্বিতীয় পুলিস

জাগুয়ারের ভেতর মাথা গলিয়ে মাইক্রোফোনে কথা বলছে। কয়েকজন লোক আহত পুলিসকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে।

'কি ঘটেছে?' জানতে চাইল রানা।

'এক মিনিট, স্যার, উনি বোধহয় পৌঁছেছেন,' মাইক্রোফোনে কাউকে বলল দ্বিতীয় পুলিস, সিধে হয়ে রানার দিকে আবার তাকাল। 'স্যার, আপনি কি মি. মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এল রানা, পুলিস কারটা পরীক্ষা করছে। গাড়ির ডান দিকের ফেন্ডার দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, ছিঁড়ে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অর্ধেকটা।

'জ্বী, স্যার, উনি এখানে,' মাইক্রোফোনে আবার বলল দ্বিতীয় পুলিস। 'এক মিনিট, স্যার।' রানার দিকে তাকাল সে। 'অফিসার সাইমন, স্যার। আপনার সাবজেক্ট মিনিট পাঁচেক আগে ব্যারিকেড ভেঙে বেরিয়ে গেছেন। নীল একটা ক্যাপরি, স্যার। থামা তো দূরের কথা, স্পীডও কমাননি।' আহত সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। লোকটা উঠে বসতে চাইছে, বাধা দিচ্ছে বাকি সবাই। 'অফিসার নেলসন, স্যার। জখম গুরুতর নয়, তবু আমি একটা অ্যামবুলেন্স ডেকেছি।'

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'কোন দিকে গেছে তারা?'

'দক্ষিণ দিকে, স্যার।'

'কি আছে ওদিকে? কোন শহর?'

'জ্বী, স্যার—সামনে ওয়ান্টেজ শহর। এই রোডের দুই পাশে ছোট দুটো পথ আছে, কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে এত কাদা জমেছে যে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়।'

রাগে ও হতাশায় মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে রানার, সামনে একটা বোল্ডার দেখে ইচ্ছে হলো লাথি মারে। ওদের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে বারবার বেরিয়ে যাচ্ছে ফেরি। কি এমন ঘটল যে বোট ছেড়ে গাড়িতে চড়ল সে?

'আপনাদের কাছে অস্ত্র ছিল না?' অফিসারকে জিজ্ঞেস করল ও।

'অস্ত্র? হ্যাঁ, স্যার, আছে তো—গাড়িতে একটা সার্ভিস রিভলবার আছে।'

'আছে তো ব্যবহার করেননি কেন?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তরুণ অফিসার। তারপর মাথা নাড়ল 'জ্বী, না, স্যার। অনুমতি নেই। রেগুলেশনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শুধু ইমার্জেন্সি দেখা দিলে, তাও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে...'

'আপনারা আপনাদের রেগুলেশন নিয়ে থাকুন। গাড়ির চাবি দিন আমাকে। কোথাও থেকে ফোন করে ওয়ান্টেজ পুলিসকে বলুন এখান থেকে দক্ষিণ দিকের সমস্ত রাস্তায় রোডব্লক সেট করতে হবে।'

'ইয়েস, স্যার। মানে, নো, স্যার। রোডব্লকের কথা বলছি, কিন্তু গাড়ির চাবি দিতে পারব না।' তরুণ অফিসার দ্বিধাগ্রস্ত, খানিকটা দিশেহারাও বটে।

মারমুখো হয়ে তার দিকে এক পা এগোল রানা। 'চাবিটা দিন! আমি আপনাকে অর্ডার করছি। তা না হলে পরে জবাবদিহি করতে হবে।'

'মানে?'

'ক্যাপরির পিছু নেননি কেন?' হিসহিস করে জানতে চাইল রানা। 'রোডব্লকে সং সেজে দাঁড়িয়ে আছেন কোন বুদ্ধিতে?' হাত পাতল রানা। 'দিন চাবি!'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল অফিসার।

জাগুয়ারে উঠল রানা, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল। আকারে ও ওজনে অস্টিনের প্রায় দ্বিগুণ এটা। তেরোশো সিসি-র অস্টিনের

স্পীড ক্যাপরিকে ধরার জন্যে যথেষ্ট নয়।

হাত ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে আটটা। চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। পুলিস যদি নিশ্ছিদ্র বেড়া তুলতে না পারে, আজ রাতে ফেরিকে ধরা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সারা রাত সময় পেলে চিরকালের জন্যে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে সে।

ওয়ান্টেজ পর্যন্ত পাঁচ মাইল রাস্তা প্রায় সরল রেখার মত। ফুল স্পীডে ছুটছে জাগুয়ার, নীল আলো ফ্ল্যাশ করছে। ফেরি শুনতে পাবে, এই ভয়ে রানা সাইরেন বাজাচ্ছে না। ট্র্যাফিক খুব কম, ওয়ার্নিং লাইটই সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। ইস্ট হ্যানী-র দক্ষিণে পৌঁছে লম্বা একটা মালবাহী ট্রেন দেখতে পেল, পশ্চিমের খোলা উপত্যকার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। মেঝের সঙ্গে অ্যাকসেলারেইটার চেপে ধরে ক্রসিং গেটের দিকে এগোচ্ছে রানা। ক্রসিং গেট নেমে আসছে, রেললাইন পার হয়ে এল জাগুয়ার, একটুর জন্যে ছাদে ঘষা খেলো না। খানিক পরই সামনের রাস্তা ধনুকের মত বেঁকে গেছে, বাঁকটা আবার সোজা হতে আলো দেখা গেল। একটা গ্রাম। গ্রামের উত্তর প্রান্তে পেভমেন্ট বরাবর লাল ফ্লেয়ার-এর আভা, বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসা দেখাচ্ছে–রোডব্লক। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন পুলিস, কাদার মধ্যে আটকে যাওয়া একটা গাড়িকে ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। জাগুয়ারের স্পীড কমাল রানা, দু'জনের একজন ছুটে আসছে ওর দিকে, চিৎকার করে বলল, 'বি/ফোরফাইভজিরোসেভেন-এর দিকে চলে গেছে ক্যাপরি…'

বাকিটা শোনার অপেক্ষায় থাকল না রানা, জাগুয়ারের স্পীড আবার বাড়াল।

সাইরেন বাজিয়ে শহরে ঢুকল রানা। সেন্ট্রাল পার্কিং এরিয়ায় কিং আলফ্রেড-এর স্ট্যাচুটা শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল, দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে পাশ কাটাল ওটাকে, দু'জন পথিক ছিটকে নিরাপদ দূরত্বে

সরে গেল। হঠাৎ করে সরু হয়ে গেছে সামনের রাস্তা। শহর থেকে বেরিয়ে ল্যামবোর্ন ডাউনস-এ চলে এল জাগুয়ার। সামনের রাস্তা সোজা এগিয়েছে। ট্র্যাফিক সিগন্যাল লাল দেখেও থামল না রানা। মনে মনে চাইছে সামনে যেন কোন রাউন্ডঅ্যাবাউট না পড়ে। ভেজা অ্যাসফল্টের ওপর বৃত্ত তৈরি করতে হলে স্পীড কমাতে হবে ওকে, কিন্তু তা কমাবার সময় পাওয়া যাবে না। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। চূড়ায় ওঠার পর সামনে একটা গাড়ি দেখা গেল। ওটার ওপর চড়াও হবার উপক্রম করল জাগুয়ার। এক মুহূর্ত পর রাস্তা ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা, বুলেট গতিতে পাশ কাটানোর সময় রানা দেখল ওটা ক্যাপরি নয়।

কয়েক মাইল পর দূরে এক সেট লাল টেইল-লাইট চোখে পড়ল। দূরত্ব কমে আসতে রানা বুঝতে পারল ড্রাইভারের ইচ্ছে নয় পথ ছাড়ে বা থামে। ক্যাপরি ছোট গাড়ি, জাগুয়ার দানবের মত ধাওয়া শুরু করল। কিন্তু রাস্তাটা ঘন ঘন মোচড় খেয়ে এগিয়েছে, ছোট বলেই বাঁক ঘুরতে সুবিধে পাচ্ছে ড্রাইভার। রাস্তার দু'পাশে ঢাল, তারপর খেত-খামার, সবশেষে গ্রাম। দীর্ঘ কয়েক মিনিট ক্যাপরির ঠিক পিছনে থাকল জাগুয়ার, যেন নাক দিয়ে বাম্পার শুঁকছে। সরাসরি পিছনে না থেকে এক পাশে সরে এল রানা, তারপর সামনে বাড়ার চেষ্টা করল, উদ্দেশ্য জাগুয়ারের নাক দিয়ে গুঁতো মেরে ক্যাপরিকে রাস্তা থেকে ফেলে দেয়া। সরল একটা বিস্তৃতি সুযোগটা বাড়িয়ে দিল। স্পীড আরও বাড়াল রানা। আর ঠিক তখনই ক্যাপরির প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালা খুলে গেল। ক্ষীণ হলেও, গুলির আওয়াজটা চিনতে অসুবিধে হলো না। চোখের পলকে মাকড়সার জালে পরিণত হলো উইন্ডশীল্ড। অন্ধের মত গাড়ি চালাচ্ছে রানা। অকস্মাৎ শক্ত ব্রেক কষল ও, ডান হাতের ঘুসি মেরে গুঁড়িয়ে দিল উইন্ডশীল্ড। গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ

নেই, পাগলামি শুরু করেছে জাগুয়ার। কাঁচ আর প্লাস্টিকের টুকরো ছিটকে এসে চোখে-মুখে পড়ছে, হুইল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ঠেকাবার সুযোগ নেই। তারপর রাস্তার ওপর গাড়িটাকে সিধে করতে পারল রানা। ভাঙা উইন্ডশীল্ডের বাইরে ক্যাপরির টেইল-লাইট দেখা যাচ্ছে, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হালকা কুয়াশার ভেতর। সেকেন্ড গিয়ার দিল রানা, গর্জে উঠে আবার নতুন উদ্যমে ধাওয়া শুরু করল জাগুয়ার।

দূরত্ব কমছে। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে বাউচারের দেয়া পিস্তলটা বের করল রানা। রিয়ার মিররটা বাঁকা হয়ে গেছে, ড্যাশ লাইটের অল্প আলোয় মুহূর্তের জন্যে নিজের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল ও–রক্তের একটা মুখোশ যেন। দূরত্ব কমছে, ক্যাপরির লাল টেইল-লাইটের ওপর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। চওড়া রাস্তা পেয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটছে ক্যাপরি, জাগুয়ারকে পাশে আসতে দিতে রাজি নয় ড্রাইভার। পাহাড়-চূড়ায় ওঠার সময় দু'পাশের ভাঙা পাঁচিল আর ঢাল হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ক্যাপরির সামনে একটা ছোট কার পড়ল। সাইরেনের আওয়াজ শুনে রাস্তার নিজের দিকটায় থাকতে চাইছে ড্রাইভার, ক্যাপরিকে সরাসরি ছুটে আসতে দেখেও সরছে না। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বুঝতে পারল ক্যাপরি রঙ সাইডেই থাকবে, ঢাল বেয়ে একটা ডোবায় নেমে গেল কার ড্রাইভার।

ক্যাপরি যখন তিন কি সাড়ে-তিন ফুট সামনে, হঠাৎ হুইল ঘুরিয়ে বাঁ দিকে সরে এল রানা, অস্ত্রটা আবার জানালা দিয়ে বাইরে বেরুবার আগেই স্পীড বাড়িয়ে জাগুয়ারের ভাঙা ডান ফেন্ডার দিয়ে গুঁতো মারল। কর্কশ ধাতব আওয়াজে রিরি করে উঠল গা, তুবড়ে গেল ক্যাপরির পিছনটা, এঁকেবেঁকে ছুটল কিছু দূর, তারপর আবার সিধে হলো। গুঁতো মারার পর পিছিয়ে পড়েছিল জাগুয়ার, আবার দূরত্ব কমিয়ে আনল রানা. এবার ডান

দিক থেকে আঘাত করবে। বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে, ধাতব সংঘর্ষের কর্কশ আওয়াজ শোনার জন্যে কান দুটো প্রস্তুত, প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে আছে, কিন্তু রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল জাগুয়ার, কোন সংঘর্ষ ঘটল না। হাইওয়ে হঠাৎ মোচড় খেয়ে বাম দিকে ঘুরে গেছে, মিলিত হয়েছে পাশের একটা রাস্তার সঙ্গে, ক্যাপরির ড্রাইভার সরে গেছে সেটায়। রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে নিচু ঘাস ঢাকা জমিনে পড়ল জাগুয়ার, বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে গাড়ি সিধে করতে চাইছে রানা। ক্যাপরি পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছে। জাগুয়ারের সামনের চাকা একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আবার শূন্যে লাফ দিল, উঠে এল রাস্তার ওপর, ফুটবলের মত ড্রপ খেলো–কিছু একটা, সম্ভবত স্প্রিঙ, ছিঁড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাপরির ব্রেকলাইট ফ্ল্যাশ করল। দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে জাগুয়ার, বাঁ দিকে হড়কাতে শুরু করল, তারপর পাক খেতে খেতে নেমে এল রাস্তা থেকে। পাক খাওয়া বন্ধ হলো কয়েকটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।

দরজা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, কোথাও আটকাচ্ছে। কাচ ভাঙা জানালা গলে বৃষ্টির মধ্যে শরীরের অর্ধেকটা বের করে আনল, মুখ থুবড়ে পড়ল ভেজা ঘাসে, নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আচ্ছন্ন বোধ করছে।

ক্যাপরির অবস্থা সামান্য হলেও ভাল। বাঁক নিয়ে যে রাস্তায় ঢুকেছিল সেটা মেটাল ক্যাটল ফেন্স দিয়ে বন্ধ করা। সরাসরি গেটে ধাক্কা খেয়েছে গাড়ি, ঘুরে গেছে, গড়িয়ে থেমেছে এমব্যাঙ্কমেন্টের গায়ে।

ক্রল করে ঘুরল রানা, হাঁটুর ওপর সিধে হলো, দরজার হাতল ধরে সাপোর্ট পাবার চেষ্টা করছে। এক মুহূর্ত পর খোলা জানালার কিনারায় আঙুল বাধিয়ে দাঁড়াতে পারল, দরজা ধরে স্থির হবার চেষ্টা করছে, দেখল চোখের সামনে ঘুরছে জগৎটা। পিছন দিকে

ঝুঁকল রানা, দরজার হ্যতল ধরে টানছে। মাত্র অর্ধেকটা খুলতে পারল। ভেতরে সব কিছু দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, কাত হয়ে রয়েছে সীটগুলো, চারদিকে উইন্ডশীল্ডের কাঁচ ছড়ানো। পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল, হাত বাড়াতে কোন রকমে নাগাল পেল। সিধে হলো রানা। টলতে টলতে ক্যাপরির দিকে এগোচ্ছে।

ক্যাপরির দুটো দরজাই খোলা, ড্রাইভার ও আরোহী পালিয়েছে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে গাড়িটার সামনে এল রানা, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে, বুঝতে চেষ্টা করছে কোন দিকে যেতে পারে ফেরি। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে শুধু একটা দিক পরিষ্কার, ক্যাপরির হেডলাইট যেদিকে তাক করা–ঘাস মোড়া ঢাল নিচে নেমে গেছে। কিন্তু সেদিকে কেউ নেই, কিছু নড়ছেও না। ওর বাঁ দিকে খাড়া একটা পাহাড়, চূড়াটা অন্ধকার আকাশে হারিয়ে গেছে। পাহাড়টার ঢালে চক সাদা সরু একটা পথ এঁকেবেঁকে বহুদূর চলে গেছে। এদিকের পাহাড় বেশিরভাগই সাদাটে আর সবুজ ঘাসে মোড়া। ঘাসের মাঝখানে তৈরি হওয়ায় অন্ধকারেও পথটা দেখা যাচ্ছে। এদিকে প্রচুর ভেড়ার খামার আছে, ওগুলোর আসা-যাওয়াতেই তৈরি হয়েছে পথটা। এমব্যাঙ্কমেন্ট পেরিয়ে সাবধানে এগোল রানা, কাছাকাছি পথ ধরে উঠে এল পাহাড়ের ঢালে। মেঘে লেগে প্রতিফলিত আলোর আভায় চক সাদা আঁকাবাঁকা পথটা এখন আরও পরিষ্কার, কয়েকশো গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সাদা পথের ওপর কালো এক জোড়া ছায়ামূর্তি। ছুটছে তারা। তারপর থামল, পথ ছেড়ে ঢালে পা রাখল, উদ্দেশ্য পাহাড়ের মাথায় পৌঁছানো। একটা ছায়ামূর্তি কয়েক পা উঠেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, দেখতে পেল রানাকে। অস্পষ্ট একটা চিৎকার শুনতে পেল রানা। দেখল ঢাল থেকে নেমে ওর দিকে ফিরে আসছে প্রকাণ্ডদেহী ফেরি।

পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ফেরি ত্রিশ গজের মধ্যে

চলে এল। গুলির আওয়াজ পেল রানা, বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। লাফ দিয়ে পথ থেকে নিচের ঢালে পড়ল রানা, ভেজা ঘাসের ওপর, ফেরির দিকে পিছন ফেরা অবস্থায়। খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে আসছে ফেরি, থেমে থেমে গুলি করছে। রানার হাতের পাশে ঘাসে লাগল একটা বুলেট, আরেকটা মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। লাফ দিয়ে ঢালে পড়ার সময় হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল পিস্তলটা, ঘাসের ওপর হাত বুলিয়ে সেটা খুঁজছে রানা। পিস্তলটা পাবার আগেই হাঁটুর ওপর সিধে হলো। ঝট করে ঘুরল ও, এখনও হাঁটুর ওপর রয়েছে, ঢালের ওপর সরু পথে ফেরিকে দেখে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার। মুঠোর ভেতর ঝাঁকি খেলো ওয়ালথার, ছুটন্ত ফেরির দাঁড়িয়ে পড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হলো অদৃশ্য কোন পাঁচিলে ধাক্কা খেয়েছে। আড়ষ্ট ও মন্থর একটা হাত তুলে বুকটা চেপে ধরল সে, ঢলে পড়ল পথের ওপর, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল ঢালে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

পুলিস কারের সাইরেন বাজছে, দ্রুত কাছে চলে আসছে আওয়াজটা। ঢাল বেয়ে রানার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে নেমে গেছে ফেরি। টলতে টলতে তার পাশে নেমে এল রানা। হাঁপাচ্ছে ও, ফেরির পাশে হাঁটু গাড়ল। চোখ খুলে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফেরি। একটা হাত তুলল সে, যেন সেটা রানাকে ধরতে বলছে। ঠোঁট দুটো কাঁপল, মনে হলো কিছু বলতে চায়। কিন্তু পরমুহূর্তে কাশতে শুরু করল সে। অদম্য কাশির সঙ্গে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। উঠে বসার চেষ্টা করল সে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঁচু করা হাতটা ধরল রানা। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা, ফেরি বসতে পারল না–মাথাটা পড়ে গেল ভেজা ঘাসে, তারপর কাত হয়ে পড়ল একদিকে। হাতটা ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো রানা।

হাইওয়ের ওপর ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিস কার। হাতে

পিস্তল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

'মি. রানা, স্যার...?'

পুলিস কারে বসে রয়েছে রানা, মুখ তুলে ঘাড় ফেরাল। গাড়ির বাইরে, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উলরিখ বাউচার, মাথায় পুলিসম্যান'স রেইন ক্যাপ। 'ফেরি মারা গেছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'জানি, মি. রানা। পুলিস তার লাশ নামিয়ে এনেছে। মেয়েটা কে আপনি জানেন...?'

'জানি,' বলল রানা।

বড় করে শ্বাস নিলেন বাউচার। 'কিভাবে জানলেন? আপনি কি তাকে দেখেছেন?'

চোখ বুজল রানা, তারপর খুলল। 'না।'

বাউচার শান্তভাবে অপেক্ষা করছেন, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে তাঁর যেন কোন আপত্তি নেই। আবার যখন কথা বলল রানা, গলার আওয়াজ এত অস্পষ্ট, জানালা দিয়ে মাথাটা প্রায় গাড়ির ভেতর গলিয়ে দিতে হলো বাউচারকে। 'কোপেনহেগেনে ঋজুর জন্যে হিলটনের একটা রুম বুক করা হয় লন্ডন থেকে। ডোনা বুক করেছিল, কাজেই আর কারও জানার কথা নয়। সিন্ডিকেটের লোকেরা তার কাছ থেকেই তথ্যটা পায়।

'লন্ডন থেকে কেউ একজন ফেরিকে তথ্য পাচার করছিল। ফেরির সঙ্গে দেখা করে যেদিন আমি লন্ডনে ফিরলাম সেদিন সন্ধ্যায় কিডন্যাপ হলো ডোনা। কিডন্যাপারদের নির্দেশ মত আমিই প্রথমে ফোন করি, তারপর ওরা আমাকে করে–যে নম্বরে করে সেটা ফোন-গাইডে নেই।

'আয়ারল্যান্ডের লিমেরিক, অ্যাথেয়া গ্রাম থেকে ডোনাকে আমি ফোন করে জানাই ফিল্ম আর পপির নমুনা আমার ফ্ল্যাটের

ঠিকানায় পাঠিয়েছি, কিন্তু ফেরিকে ফোন করে বলি আপনার নামে পাঠিয়েছি। পার্সেলটা আয়ারল্যান্ড থেকে বেরুতেই দেয়া হয়নি। স্কারটাগলিন থেকে ফোনে ডোনাকে জানাই আমি একটা ট্রাক ছিনতাই করেছি। দু'ঘণ্টা পরই সিন্ডিকেটের লোকেরা আমাকে ধরে ফেলে। কাস্টমস হেডকোয়ার্টার থেকে ফেরি বেরিয়ে পড়ে, ওয়েলস-এ এক মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে—ওই একই সকালে ডোনাও লন্ডন ত্যাগ করে। অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে এগুলো যথেষ্ট প্রমাণ নয়, জানি। তবে অকাট্য প্রমাণও আছে আমার কাছে।

'শুধু ডোনা আর স্বাতী জানত স্পেসওয়াচ-টু স্যাটেলাইট সিস্টেম অ্যাসিটিক হাইড্রাইড-এর উৎস আবিষ্কারের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের ভিনিয়ার্ড বা ফার্মটা চিহ্নিত করেছিল।'

একজন পুলিস এগিয়ে আসছে দেখে হাত নেড়ে তাকে দূরে থাকতে বললেন বাউচার। তারপর রানার দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, 'অ্যাসিটিক হাইড্রাইড-এর ব্যাপারটা কি?'

'স্যাটেলাইট আইডেনটিফিকেশনের ব্যাপারটা ডোনা জানত,' বলল রানা। 'ওয়াশিংটন থেকে আমি যখন জিম ফিশারের ফোনটা পাই, সে তখন আমার ফ্ল্যাটের অফিসেই ছিল। তথ্যটা ফেরিকে সে জানিয়ে দেয়।'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'হেলিকপ্টারে সিন্ডিকেটের একজন লোক স্যাটেলাইট সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে। ক্যাসেটে সব রেকর্ড করা আছে।'

'আই সী,' বিড়বিড় করলেন বাউচার। 'কিন্তু একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না, মি. রানা, স্যার। প্রথম থেকেই যখন জানতেন যে ডোনা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাকে ইন্টারোগেট করেননি কেন? ইন্টারোগেট করলে সব তথ্য বেরিয়ে আসত...'

'ডোনাকে সন্দেহ করেছিলাম, নিশ্চিতভাবে কিছু জানতাম না,'

বলল রানা। 'তাছাড়া, আপনাকে জানাতে আপত্তি নেই, রানা এজেন্সির কোন এজেন্টকে ইন্টারোগেট করে তথ্য বের করা প্রায় অসম্ভব-সেভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওদেরকে।' এজেন্টদের মুখের ভেতর সায়ানাইড ভরা নকল দাঁত আছে, এই তথ্যটা রানা গোপনই রাখল।

হাত নেড়ে আপত্তি করায় একজন পুলিস অফিসার দূরে সরে গেলেও, আবার এগিয়ে এসে বাউচারের সঙ্গে কথা বলল সে, হাত দিয়ে ক্যাপ ছুঁয়ে। 'স্যার, মেয়েটাকে আমরা পেয়েছি। সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে?' প্রতিধ্বনি তুলে দ্রুত রানার দিকে ফিরলেন বাউচার।

'জ্বী, স্যার। ঢালটা ওদিকে একদম খাড়া, স্যার। একে অন্ধকার, তার ওপর বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়, একটা মেটাল পোস্টে বাড়ি খায় মাথাটা।'

চোখ বুজল রানা।

'ঠিক আছে,' বলে হাত নেড়ে অফিসারকে বিদায় করে দিলেন বাউচার। 'মি. রানা,' বললেন তিনি, 'আমি...'

'আমাকে একটু একা থাকতে দিন,' বলল রানা। 'প্লীজ।' ডোনার কথা মন থেকে মুছে ফেলেছে ও, চোখের সামনে শুধু ঋজুর মুখটা ভাসছে।

***